মুনীয়াতুল মুছ্‌লেমীন

[মাছআলা-মাছায়েল]

১ম খন্ড

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

প্রকাশনায়

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া, বাংলাদেশ

মুনীয়াতুল মুছ্‌লেমীন

(মাছআলা-মাছায়েল)

[প্রথম খন্ড]

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্‌-কাদেরী

প্রকাশনায়

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া, বাংলাদেশ

মুনীয়াতুল মুছ্‌লেমীন

(মাছআলা-মাছায়েল)

[প্রথম খন্ড]

গ্রন্থ স্বত্ব:

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সার্বিক তত্ত্বাবধানে:

শাহজাদা অধ্যক্ষ আল্লামা আবুল ফরাহ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন

অনুবাদ:

এম. এম. মহিউদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক-মাসিক আল-মুবীন

শিক্ষক- ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মূঈনীয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা

সহযোগিতায়:

শাহজাদা আল্লামা আবুল ফছিহ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন

আর্থিক সহযোগিতা

মৌলভী মুহাম্মদ জিয়াউল হক সওদাগর

পিতা: মরহুম আলহাজ্ব এমদাদুল হক সওদাগর

ধর্মপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

বর্তমান ঠিকানা: প্রোপ্রাইটর: আল্-গাউছিয়া কার্পেট, সারজা।

সভাপতি: আনজুমানে কাদেরীয়া চিশতীয়া আজিজিয়া সারজা শাখা

প্রকাশকাল:

জুলাই–২০১৪ ঈসায়ী

হাদীয়া:

২০০ [**দুইশত**] টাকা মাত্র।

প্রকাশনায়

আন্‌জুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া আজিজিয়া, বাংলাদেশ

উৎসর্গ

হানাফী মাযহাবের প্রবর্তক ইমামুল মুসলেমীন **হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা নো'মান ইবনে সাবেত আল্-কুফী** (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)'র প্রতি...

সূচীপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	লিখকের কথা	০৭
০২	অনুবাদকের কথা	০৮
০৩	পবিত্রতার বর্ণনা	০৯
০৪	গোসলের বর্ণনা	১০
০৫	নামাযের বর্ণনা	১৩
০৬	আজানের বর্ণনা	৩২
০৭	অজুর বর্ণনা	৩৭
০৮	মসজিদের বর্ণনা	৪৫
০৯	ঈদের নামাযের বর্ণনা	৫০
১০	খোতবার বর্ণনা	৫২
১১	জুমার বর্ণনা	৫৩
১২	ইমামতের বর্ণনা	৫৫
১৩	ঈমান–আক্বীদার বর্ণনা	৫৬
১৪	কেরাত ও তাজবীদের বর্ণনা	৬৬
১৫	লাউড স্পীকার দ্বারা নামাজ আদায়ের বর্ণনা	৬৭
১৬	পোশাক পরিধানের বর্ণনা	৬৯
১৭	মৃতের কাফনের বর্ণনা	৭১
১৮	মৃতকে কবরে রাখার বর্ণনা	৭৩
১৯	লাশ বহন, কবর যিয়ারত ও তাল্‌কীন এবং লাশ হস্তান্তর ইত্যাদির বর্ণনা	৭৪
২০	নবী ﷺ'র জানাযার নামায ও দাফনের বর্ণনা	৭৮
২১	ইছালে ছাওয়াবের বর্ণনা	৮০

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
২২	ছাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের বর্ণনা	৮১
২৩	মুসাফির ও মুসাফিরের নামায-রোজার বর্ণনা	৮৩
২৪	রোযার বর্ণনা	৮৮
২৫	ফিদিয়ার বর্ণনা	৯৫
২৬	রাসূল ﷺ'র প্রস্রাব মোবারকের হুকুম	৯৬
২৭	জারজ সন্তানের যবেহ'র হুকুম	৯৬
২৮	খতম তারাবীর দোয়ার বর্ণনা	৯৭
২৯	কিবলার বর্ণনা	৯৭
৩০	ছবির বর্ণনা	৯৮
৩১	জানাযার নামাযের বর্ণনা	৯৮
৩২	মৃতকে গোসল দেয়ার বর্ণনা	১০২
৩৩	কবর যেয়ারতের বর্ণনা	১০৫
৩৫	তায়াম্মুমের বর্ণনা	১০৭
৩৬	মোজার উপর মাসেহ করার বর্ণনা	১০৭
৩৭	খাদেম নিযুক্তের বর্ণনা	১০৮
৩৮	মাথা মুন্ডানোর বর্ণনা	১০৯
৩৯	বেদ্আতের বর্ণনা	১০৯
৪০	খেজাব করার বর্ণনা	১১১
৪১	সালামের বর্ণনা	১১২
৪২	কিয়ামত দিবসে উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা	১১৮
৪৩	বেলায়ত ও অলীর বর্ণনা	১১৯
৪৪	জ্ঞান অর্জনের ফজিলত	১২৭

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
৪৫	মে'রাজের বর্ণনা	১২৯
৪৬	নবী-রাসূল পাঠানোর হিকমত	১৩০
৪৭	নিশ্চুপ থাকার ফজিলত	১৩১
৪৮	শেষ যুগে আলেম ও অজ্ঞদের অবস্থার বর্ণনা	১৩২
৪৯	রাসূল ﷺ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী	১৩৩
৫০	পীর মুরিদের হুকুম	১৩৭
৫১	বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ মাছআলা	১৪৪

****

লিখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدلله رب العٰلمين والصلوٰة والسّلام على سيّد الانبياء والمرسلين وعلى آلـه واصحابـه أجـمعين, امّا بعد!

হামদ, সালাত ও সালাম নিবেদনের পর আমি অধম ফক্বীর, হাক্বীর ও মীসকীন দ্বীনি ভাইদের খেদমতে নিবেদন করছি যে, সহায়-সম্বল এবং উপায় উপকরণের অভাবের কারণে লেখক সমাজের মধ্যে গণ্য হবার ইচ্ছা নেই। অধম বান্দাহ কেবল নিজ পরকালীন নাজাতের উপায় মনে করে বন্ধু-বান্ধবের চাহিদা অনুযায়ী কতিপয় প্রয়োজনীয় মাছআলা সহজ সরল উর্দু ভাষায় হানাফী মায্হাবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব থেকে চয়ন করে একস্থানে একত্রিত করেছি। যাতে স্বল্প যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও মাছআলা বুঝতে কষ্ট না হয়, সে জন্য আমার স্নেহের মৌলভী মুহাম্মদ মহিউদ্দীন'কে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার দায়িত্ব অর্পন করি। যদি কোন আলেমের কাছে এইকিতাবে নিজ তাহকীকের বিরোধী কোন মাছআলা পরিলক্ষিত হয়, তবে রেফারেন্সকৃত কিতাব সমূহ দেখার পর নগন্য বান্দাহকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

হে রাব্বুল আলামীন! তোমার হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসীলায় এই কিতাবের পাঠক ও কিতাব প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলকে কবুল করে ইহকাল ও পরকালে কামিয়াবী নসীব করুন। আর তাদের আমলের সদ্ক্বা হিসেবে এই অধমকে মাফ করুন আমীন, ছুম্মা আমীন।

গ্রন্থকার

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

অনুবাদকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نحمده حمدًا كثيرًا ونصلى ونسلم على رَسُوله الكريم واله واصحابه اجمعين

প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন, অসংখ্য আলেম ওলামার শিক্ষাগুরু, মুফাক্কেরুল ইসলাম, শাইখে তরিকত, পেশোয়ায়ে আহলে সুন্নাত, বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক সৈয়্যদী মুর্শেদী হযরতুলহাজ্ব **আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.)** নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহ থেকে চয়ন করে ওযু, গোসল, তায়াম্মুম, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, নামাজ, রোজা ইত্যাদির মাছায়েল একত্রিত করে উর্দু ভাষায় **"মুনীয়াতুল মুছলেমীন"** নামক একখানা কিতাব রচনা করেছেন। আমি অধম সর্বসাধারণের পাঠের সুবিধার্তে হুজুর কেবলার নির্দেশক্রমে আমার স্বল্প জ্ঞান সত্বেও হুজুরের দোয়া ও শুভদৃষ্টিকে একমাত্র সহায়-সম্বল করে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করি। মূল ভাবার্থকে যথাযথভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটা স্বাভাবিক। এজন্য পাঠক মহলের কাছে আবেদন, আপনাদের ক্ষমা সুন্দর আচরণই হবে অধমের অনাগত ভবিষ্যতের একমাত্র দিশারী। কারো কাছে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে প্রকাশনা সংস্থাকে অবহিত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। কিতাবটি অনুবাদের কাজে যাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষ করে প্রানপ্রিয় মুহতারাম প্রিন্সিপাল শাহজাদা আল্লামা আবুল ফরাহ মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন ও শাহজাদা আল্লামা আবুল ফছিহ মুহাম্মদ আলাউদ্দীন সাহেবের শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতা না পেলে অধমের পক্ষে এ কাজের আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হত না। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন তাদেরকে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

অনুবাদক

এম.এম. মহিউদ্দীন

শিক্ষক: ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্‌রাসা

নির্বাহী সম্পাদক: মাসিক আল্-মুবীন

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

পবিত্রতার বর্ণনা

মাছআলাঃ (০১)

অজু ছাড়া নামাজ পড়া হারাম এবং কঠিন ও শক্ত গোনাহর কথা। বরং জেনে শুনে পবিত্রতা অর্জন ছাড়া নামাজ আদায় করা ওলামায়ে কেরামগণ কুফুরী লেখেছেন। কেননা অজু ও গোসল ছাড়া নাপাকী অবস্থায় নামাজ আদায়কারী ইবাদতের সাথে বেআদবী এবং অবজ্ঞা করেছে কাজেই এটি কুফুরী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের চাবি হচ্ছে নামাজ আর নামাজের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা।[১]

মাছআলাঃ (০২)

ماء راكد (আবদ্ধ পানি) এ অজু ও গোসল জায়েজ কি না? আবদ্ধ পানিতে অজু ও গোসল করা মাকরূহ। বিশুদ্ধ হাদীসে তা না জায়েজ বলা হয়েছে।

ويكره الغسل والوضوء فى الماء الراكد وكثيرًا لاصح من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغسل فيه (الترياق صفحه- ٢٤)

মাছআলাঃ (০৩)

রং, খোশবু এবং স্বাদ অপবিত্র বস্তু পড়ার কারণে যদি উক্ত গুণ সমূহের পরিবর্তন ঘটে সেক্ষেত্রে উক্ত পানি দ্বারা অজু ও গোসল করা বৈধ নয়। যদি পবিত্র বস্তু পতিত হওয়ার কারণে যেমন- সাবান, জাফরান ইত্যাদি কারণে কিংবা পানি অনেকদিন বন্ধ থাকার কারণে রং, খোশবু ও স্বাদ পরিবর্তন হলে উক্ত পানি অপবিত্র নয়। উক্ত পানি দ্বারা গোসল এবং অজু করা বৈধ। তবে পানি পাওয়া যেতে হবে। অর্থাৎ পানি যেন গাঢ় না হয়ে পাতলা হয়।

[১]. হামারা ইসলাম

প্রবাহিত তথা প্রবাহমান পানির হুকুম হচ্ছে- পানি এই পরিমান হতে হবে যে- যদি কেউ এতে পাতা ফেলে দেয় তা প্রবাহমান হবে। তবে সে পানির উৎপত্তি স্থল তথা শুরু পবিত্র হবে অর্থাৎ যেখান থেকে পানি প্রবাহিত হয়েছে, তা পবিত্র হতে হবে। যদিওবা অপবিত্র বস্তু ভাসমান হবে তবু উক্ত পানি পাক। সে পানি দ্বারা অজু ও গোসল করা বৈধ।

গোসলের বর্ণনা

মাছআলা: (০৪)

গোসল চার প্রকার। যথা: ১) ফরজ ২) ওয়াজিব ৩) সুন্নাত ৪) মুস্তাহাব।

মাছআলা: (০৫)

পাঁচ প্রকারের গোসল ফরজ। যথা: (১) ইহ্তেলাম (স্বপ্নযোগে বীর্য বের হওয়া) (২) জেহান্দি মনি **جهندی منی** (শরীর উত্তেজিত বশত: বীর্য বের হওয়া) (৩) জানাবাত (স্বামী-স্ত্রীর সহবাস জনিত গোসল) (৪) হায়েজ (স্ত্রীদের মাসিক ঋতুস্রাব) (৫) নেফাস (বাচ্চা প্রসাবের পর মেয়েদের নিকট হতে যে রক্তস্রাব বের হয়)।

(১) ইহ্তেলাম:- কোন ব্যক্তি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নে দেখার পর জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা দেখলে তার উপর গোসল ফরজ। আর যদি কাপড় ভিজা না দেখে তার উপর গোসল ফরজ নয়।

(২) (জেহান্দি মনি) **جهندی منی** :- কোন ব্যক্তির শাহ্ওয়াতের কারণে শরীর উত্তেজিত হয়ে মনি নির্গত হলে তার উপর গোসল ফরজ।

(৩) জানাবাত:-মহিলার উভয়ই রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ সামনে ও পিছনের রাস্তা দিয়ে সামান্য পরিমাণ লিঙ্গ প্রবেশ করলে উভয়ের উপর গোসল ফরজ। তবে মহিলাদের সামনের রাস্তা হালাল আর পিছনের রাস্তা অভিশপ্ত।

(৪) হায়েজ:- মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রতি মাসে ঋতুস্রাব জনিত রক্ত প্রবাহিত হওয়া। তবে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর হতে পারে। অর্থাৎ সময়ের মধ্যে একেকজনের একেক রকমের বিদ্যমান। তবে সর্বনিম্ন হচ্ছে তিন দিন আর সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে ১০ দিন পর্যন্ত। আর যদি ১০ দিনের

বেশী রক্ত প্রবাহিত হয় তবে এটিকে ইস্তেহাজা জনিত রোগ বলে। তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত মহিলা গোসল করে নামাজ পড়বে এবং তার স্বামীর খেদমতে হাজির থাকবে।

(৫) নেফাস:- মহিলাদের সন্তান প্রসাবের পর যে রক্ত প্রবাহিত হয়। তবে এক্ষেত্রে রক্ত বের হওয়াটা কারো দশ দিন, কারো পনর দিন আবার কারো পঁচিশ দিন, কারো এক মাস এবং সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন সময়সীমা। আর যদি চল্লিশ দিন হতে বেশী রক্ত প্রবাহিত হয় তবে তাহা হবে ইস্তেহাজা জনিত রোগ। সেক্ষেত্রে উক্ত মহিলা গোসল করে নামাজ আদায় করবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে।

মাছআলা: (০৬)

ওয়াজিব গোসল দুই রকম- যথা: (১) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া জীবিতদের উপর ওয়াজিব। (২) যদি কাফের মুসলমান হওয়ার জন্য জুনুবী তথা অপবিত্রাবস্থায় আসে এমতাবস্থায় গোসল করা ওয়াজিব।

মাছআলা: (০৭)

সুন্নাত গোসল পাঁচ রকমের। যথা: (১) জুমার দিন নামাজের পূর্বে গোসল করা। (২) ঈদুল ফিতরের দিন নামাজের পূর্বে। (৩) ঈদুল আজহার দিন নামাজের পূর্বে। (৪) আরাফাতের দিন অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ দিবসে। যা হাজীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। (৫) ইহ্‌রাম বাঁধার সময় গোসল করা হাজ্বীদের জন্য সুন্নাত।

মাছআলা: (০৮)

মুস্তাহাব গোসল তিন ভাবে হয়ে থাকে। যথা: (১) ছেলে কিংবা মেয়ে যখন তাদের বালেগ হওয়ার বছর আরম্ভ হবে। তখন তারা গোসল করা মুস্তাহাব।

জ্ঞাতব্য যে মেয়েদের ক্ষেত্রে বালেগা হওয়ার সময় ৯ বৎসর হতে আরম্ভ হয়। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে বালেগ হওয়ার সময় ১২ বৎসর হতে আরম্ভ হয়। যে দিন হতে মেয়েদের ৯ বৎসর আরম্ভ হবে। আর ছেলেদের ১২

বৎসর শুরু হবে তখন তারা বালেগ হিসেবে পরিগনিত হবে। অর্থাৎ তখন হতে তারা উভয়ের উপর নামাজ রোজা ইত্যাদি শরীয়তের হুকুম আহকাম ফরজ হয়ে থাকে।

(২) নাবালেগ ছেলে মেয়েরা যখন অপবিত্র হবে তখন তাদেরকে গোসল করানো মুস্তাহাব।

(৩) যখন কোন কাফের মুসলমান হওয়ার জন্য আসবে এবং অপবিত্র অবস্থায় না হয় তখন তাকে গোসল করানো মুস্তাহাব।

মাছআলাঃ (০৯)

পানি যদি ঘোলাটে হয়, উক্ত পানি দ্বারা গোসল ও অজু করা বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত গন্ধ এবং স্বাদ পরিবর্তন না হবে।

মাছআলাঃ (১০)

রং, খোশবু এবং স্বাদ অপবিত্র বস্তু পড়ার কারণে যদি উক্ত গুণ সমূহের পরিবর্তন ঘটে সেক্ষেত্রে উক্ত পানি দ্বারা অজু ও গোসল করা বৈধ নয়। যদি পবিত্র বস্তু পতিত হওয়ার কারণে যেমন- সাবান, জাফরান ইত্যাদি কারণে কিংবা পানি অনেকদিন বন্ধ থাকার কারণে রং, খোশবু ও স্বাদ পরিবর্তন হলে উক্ত পানি অপবিত্র নয়। উক্ত পানি দ্বারা গোসল এবং অজু করা বৈধ। তবে পানি পাওয়া যেতে হবে। অর্থাৎ পানি যেন গাঢ় না হয়ে পাতলা হয়।

প্রবাহিত তথা প্রবাহমান পানির হুকুম হচ্ছে- পানি এই পরিমান হতে হবে যে- যদি কেউ এতে পাতা ফেলে দেয় তা প্রবাহমান হবে। তবে সে পানির উৎপত্তি স্থল তথা শুরু পবিত্র হবে অর্থাৎ যেখান থেকে পানি প্রবাহিত হয়েছে, তা পবিত্র হতে হবে। যদিওবা অপবিত্র বস্তু ভাসমান হবে তবু উক্ত পানি পাক। সে পানি দ্বারা অজু ও গোসল করা বৈধ।

নামাযের বর্ণনা

মাছআলাঃ (১১)

আছরের ওয়াক্তের সময় কোন সুন্নাত পড়া আবশ্যক নয়। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় চার রাকাত আবার কখনো দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ ফরজের পূর্বে আদায় করতেন। এ জন্য তা পড়া উত্তম।

ويستحب اربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها بتسلمية وان شاء ركعتين (در مختار)

মাছআলাঃ (১২)

মাগরিবের নামাজের সময় তিন রাকাত ফরজ নামাজের পূর্বে কোন নামাজ না পড়া আবশ্যক। ফরজের পরে দুই রাকাত সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। এ দুই রাকাতের পরে দুই, চার, কিংবা ছয় রাকাত নফল নামাজ আদায়ে অনেক ছাওয়াব নিহিত। কোন কোন হাদিসে বিশ রাকাতের কথাও উল্লেখ রয়েছে। এই নামাজকে সাধারণত সালাতুল আউয়াবীন বলা হয়।

দুররে মোখতার গ্রন্থে রয়েছে– **وست بعد المغرب ليكتب من الاوابين** মাগরিবের পরে ছয় রাকাত নামাজ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে এর মধ্যে দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা অন্তর্ভূক্ত করে চার রাকাত বৃদ্ধি করে আদায় করলে এর ছাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে হাদিস শরীফে **صلواة الاوابين** কে **صلواة الضحىٰ** বলা হয়েছে।

মাছআলাঃ (১৩)

পবিত্র রমজান মাসে এশার ফরজ ও সুন্নাতের পর বিতিরের পূর্বে বিশ রাকাত তারাবীহর নামাজ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এর পর বিতির জামাতে আদায় করা উত্তম।

মাছআলাঃ (১৪)

দিনের বেলায় নফল নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে দুই কিংবা চার রাকাতের বেশীর নিয়ত না করা ভাল। আর রাতের বেলায় দুই, চার ও আট রাকাত পর্যন্ত এক নিয়তে পড়া যাবে, তবে দুই রাকাতের নিয়ত করা উত্তম। অনুরূপ দিনের বেলায় নফল নামাজের কেরাত চুপে চুপে পড়া উত্তম। আর রাতের বেলায় গোপনে ও উচ্চস্বরে উভয়ের অনুমতি রয়েছে। যদি নিকটে কোন মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় রয়েছে তবে সেক্ষেত্রে উচ্চস্বরে না পড়া চায়, কেননা এতে ঘুমন্ত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গের আশঙ্কা থাকবে।

মাছআলা: (১৫)

তাহাজ্জুদ নামাজের সময় হচ্ছে এশার পর হতে সুবহে সাদেক পর্যন্ত। পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফে এর বর্ণনা রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা রাত্রে দু'চার ঘন্টা আরাম করার পর তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য উঠে যেতেন। অধিকাংশ সময় দন্ডায়মান অবস্থায় নামাজ আদায় করাতে তাঁর পা মোবারক ফুলে যেত।

যতদিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হয়নি ততদিন পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাহাজ্জুদ নামাজ ফরজ ছিল। যখন নামাজ ফরজ হয় তখন তা (তাহাজ্জুদ) নফল হিসেবে হয়ে যায়। ছাহাবায়ে কেরামগণের মধ্যে অধিকাংশ ছাহাবী তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন।

ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে–

فى الليل رهبان والنهار فرسان

অর্থাৎ: রাত্রে তাঁরা দুনিয়া বিমুখ তথা একাগ্রহচিত্তে আল্লাহর ইবাদত করতেন আর দিনের বেলায় সাহসিকতার সহিত বীরযোদ্ধা হিসেবে জিহাদের ময়দানে যুদ্ধ করতেন। ছাহাবায়ে কেরামদের অনেকে এই নামাজ আদায় করতেন। এই নামাজকে **دأب الصالحين** তথা আল্লাহ্ ওয়ালার নামাজ বলা হয়ে থাকে।

মাছআলা: (১৬)

তাহাজ্জুদ নামাজ কয় রাকাত তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই, বরং দুই, চার, ছয় কিংবা আট রাকাত যে পরিমাণ ইচ্ছা পড়ে নেওয়া ভাল। সাধারণত:

হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আট রাকাত আদায় করতেন। অর্ধ রাতের পর তা আদায় করা খুবই ভাল ও উত্তম।

আর যদি কখনো শরীরে অলসতা কিংবা দুর্বলতা অনুভব হয়, তবে এশার নামাজের পরে, অর্থাৎ এশারের ফরজ ও সুন্নাত আদায় করার পর এবং বিতির নামাজের পূর্বে দুই কিংবা চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করে নেয়া ভাল। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ করে এশারের ফরজ ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আদায় শেষে দুই রাকাত করে চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করতেন। এ জন্যই তা আদায় করাতে সুন্নাত নামাজের ছাওয়াব ও পূণ্য নিহিত। অনুরূপ তাহাজ্জুদ নামাজেও সুন্নাতের ছাওয়াব বিদ্যমান। আর যদি তাহাজ্জুদ নামাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব না হয় তবে এশার নামাজের পরে নফল নামাজগুলো আদায় করতে পারলে ভাল। এ নামাজ আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে এবং ধর্মের উপর অটল থাকা সর্বোপরি ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে যত প্রকার মুছিবত ও কষ্ট আসুক না কেন তা বরদাশ্‌ত ও ধর্য্য ধারণের ক্ষেত্রে বড় সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। এই নামাজের মাধ্যমে আত্মা ও নফস পরিশুদ্ধ ও সংশোধন হয়ে থাকে। জবান ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাছির তথা অনুকম্পা ও আকর্ষণ এবং সাথে সাথে খেয়াল-ধারণার মধ্যে যে রকম খুলুসিয়ত ও অন্তরঙ্গতা এবং কলব ও দিলে শান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা সাধারণত অন্য কোন নফল নামাজ দ্বারা কিংবা কোন তাছবীহ ও জিকির দ্বারা সৃষ্টি হয় না। পবিত্র কোরআন শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে-

{ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً}

(রাত্রে ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে উঠার মধ্যে আত্মার পবিত্রতা এবং স্বস্তি ও অটলতা সৃষ্টি হয়। আর কথাবার্তা সম্পূর্ণ ভাবে দুরস্ত ও অকপটে এবং ভদ্র ভাবে হয়ে যায়।[২]

হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে–

عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم الى ربكم ومكفرة للسيات ومنهاة عن الاثم-

অর্থাৎ: তোমরা রাত্রে জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করাকে তোমাদের জন্য আবশ্যক করে নাও। এ নিয়মটি তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার ও বুজুর্গ লোকদের অভ্যাস ছিল। এ নামাজ তোমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যবান ও প্রতিবেশী হিসাবে করে নিবে। আর তোমাদের গুনাহকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবে।

হযরত ছাওয়াবন (রা:) হতে বর্ণিত রয়েছে যে- রাত্রে জাগ্রত হওয়া খুবই কষ্টকর ও বোঝা। যখন তোমরা বিতির নামাজ পড়বে তখন দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিও।

فاذا الاوتر احدكم فليركع ركعتين فان قام من الليل والاكانتا له (رواه احمد مشكواة شريف)

যদি রাত্রে জাগ্রত হয়ে উঠতে পারলেতো ভাল, তা না হলে এই দুই রাকাত নামাজই এর জন্য যথেষ্ট। এই নামাজ তাহাজ্জুদ নামাজের স্থলাভিসিক্ত হবে। আল্লাহ্পাক আমরা গুনাহগার ও মৃত্যুসম উম্মতদেরকে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উসিলায় দয়া ও মেহেরবানী করেছেন। যদি কেউ তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় না করে থাকে তাহলে দিনের বেলায় হউক কিংবা রাত্রের যে কোন সময় দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করতে পারলে ভাল।

[২]. কাশ্শাফ।

মাছআলাঃ (১৭)

تحية المسجد و تحية الوضوء এর বর্ণনা ঃ কোন মানুষ যদি ওজু করার পর দু'রাকাত নামাজ আদায় করে তাহলে এতে প্রচুর ছাওয়াব বিদ্যমান। যাকে তাহিয়্যাতুল ওজু বলা হয়ে থাকে। এর ফজিলত ও মর্তবা অনেক। এমনিভাবে মসজিদে প্রবেশ করার সাথে সাথে দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করার মধ্যেও অসংখ্য ছাওয়াব নিহিত। যাকে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বলা হয়ে থাকে। আবার অনেকের মতে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ ওয়াজিব।

অন্য একটি হাদিস শরীফে নফল নামাজকে **مجبّرات الصلواة** বলা হয়েছে। অর্থাৎ ফরয, সুন্নাত নামাজের মধ্যে যে কমতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে থাকে উক্ত নফল নামাজ দ্বারা পরিপূর্ণ ও ক্ষয় পূরণ হয়ে যায়। তবে উম্মতের আছান তথা সহজতর হিসাবে এই নামাজকে আবশ্যক করা হয়নি। নিম্নে কয়েকটি নফল নামাজের পরিচিতি দেওয়া হলোঃ

এক. اشراق (এশ্‌রাক) এর বর্ণনাঃ এশ্‌রাক হচ্ছে সূর্য্য উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর দু'রাকাত নফল নামাজ আদায় করা। হাদিস শরীফে এর অনেক ছাওয়াবের কথা বলা হয়েছে এবং হুজুর ছৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন; যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জমাতে আদায় করার পর সূর্য্য উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর জিকির আজকার ও তাছবীহ-তাহলীলে পাঠরত থাকার পর এশরাকের নামাজ আদায় করবে, আল্লাহ পাক তাকে এবং তার সাথে সম্পৃক্ত আরো সত্তর হাজার লোককে ক্ষমা করে দিবেন।

দুই. صلواة الضحى (ছালাতুদ দ্বোহা) এর বর্ণনা: এই নামাজ সূর্য্য যখন পরিপূর্ণ হবে তখন দু'রাকাত করে চার রাকাত নামাজ আদায় করার ব্যাপারে হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে। আট রাকাতও পড়া যাবে। এই নামাজকে চাশতের নামাজও বলা হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাজ বেশাবেশী আদায় করতেন।[৩]

[৩]. বুখারী ও মুসলিম শরীফ।

সাধারণত মাগরীবের নামাজের পরে ছয় রাকাত যে নফল নামাজ আদায় করা হয়ে থাকে তাকে জন সাধারণ **صلواة الاوّابين** (ছলাতুল আউয়াবীন) বলে। তবে হাদিস শরীফে **صلواة الضحى** কে **صلواة الاوّابين** বলা হয়েছে। হাদিস শরীফে আছে–

صلواة الاوّابين حين ترمض الفضال (مسلم شريف)

অর্থাৎ: **صلواة الاوّابين** বলা হয় যখন অতিমাত্রায় রৌদ্রের তেজ ও তাপের কারণে উটের বাচ্চা পা নাড়তে থাকে। এ ছাড়া আরও নফল নামাজের বর্ণনা হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে। যেমন- **صلواة التسبيح, صلواة الحاجة, صلواة الاستخاره** ইত্যাদি। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিয়ম ও আদত মোবারক ছিলেন যে, যখনই কোন খুশী কিংবা পেরেশানীর সংবাদ শ্রবণ করতেন তখনই নামাজ তথা কৃতজ্ঞতা সূচক সিজদার জন্য দন্ডয়মান হয়ে যেতেন। খুশী ও আনন্দের ক্ষেত্রে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন আর পেরেশানী ও মুছিবতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাহায্য ও মদদ প্রার্থনা করতেন।

হযরত খোজাইফা (রা:) হতে বর্ণিত–

كان النبى ﷺ اذ احزبه امر صلى (ابوداؤد شريف)

অর্থাৎ: যখন কোন পেরেশানীর কথা শ্রবণ করতেন বা পেরেশানীর কথা আসত তখন তিনি নামাজের জন্য দন্ডয়মান হয়ে যেতেন।

মাছআলা: (১৮)

রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ জমাত সহকারে আদায় করা জায়েজ। হযরত আওফ ইবনে মালেক (রা.) তাহাজ্জুদের নামাজে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইকতেদা করেছিলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দন্ডয়মান হত। তবে শর্ত হচ্ছে

এই জামাতের জন্য কোন ডাকা-খোঁজা কিংবা আজান-ইকামত দেওয়া যাবে না।[৪]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রা.) হতে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে।

অত্র হাদীস দ্বারা অনেক মাছআলা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। প্রথমত: হচ্ছে নফল নামাজ বিশেষত: তাহাজ্জুদ নামাজ জামাতে আদায় করা জায়েয। যখন এর জন্য আজান, একামত ও লোকজনকে ডাকা-ডাকি এবং আহ্বান করার ব্যবস্থা না হবে।[৫]

মাছআলা: (১৯)

কোন ব্যক্তি ভুলবশত: প্রথম রাকাতে সূরায়ে নাছ পাঠ করল এক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাকাতেও সূরায়ে নাছ পাঠ করবে।

ফতহুল ক্বদীরে বর্ণিত রয়েছে:

قرأ فى الاولى بقل اعوذ برب الناس يقرء فى الثانية هذه السورة ايضًا لابأس ان يقرء سورة ويعيدها فى الثانية -

তানভীরে আছে:

افادانّه يكره تنـزيهًا وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة .[৬]

মাছআলা: (২০)

কোন ব্যক্তি নামাজের শেষ বৈঠকে জামাতে শরীক হলে তখন এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণ আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করেই নামাজ পুরো করবে।[৭]

মাছআলা: (২১)

---

[৪]. মেরাত ২য় খন্ড ৭৬ পৃষ্ঠা
[৫]. মেরআত ২য় খন্ড ১৯০ পৃষ্ঠা
[৬] احسن الفتوای, صفه ২৪৪
[৭]. মাহমুদীয়া, ১৪ খন্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা

যে সকল ফরজ নামাজের পর সুন্নাত রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ফরজ ও সুন্নাতের মধ্যবর্তী **فاصله** তথা পৃথক আছে?

হ্যাঁ! ফরজ ও সুন্নাত নামাজের মধ্যবর্তী **فاصله** (পৃথক) কথা-বার্তার মাধমে হউক কিংবা স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে হউক তা সুন্নাত।

ويسن ان يفصل بين السنة والفرض بكلام او انتقال والافضل ان ينتقل المنتقل ومصلى فرض من موضع فرضه (الترياق النافع صفه ৪৭)

মাছআলা: (২২)

কবরস্থানে নামাজ পড়া, গোনাহর জায়গায় তথা **ارض مغصوبين** (অভিশপ্ত জায়গা) নামাজ পড়া কেমন? এ সমস্ত স্থানে নামাজ পড়া নাজায়েজ।

وتكره الصلواة فى المقبره ، وتكره الصلواة فى محل المعصيه وتحرم فى الاماكن المغصوبة -

অর্থাৎ কবরস্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ, গোনাহর স্থানে নামাজ পড়া মাকরূহ এবং **ارض مغصوبه** (অভিশপ্ত জায়গা) নামাজ পড়া হারাম।[৮]

মাছআলা: (২৩)

যে বৎসর মদীনা মোনাওয়ারার মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, হিজরতের প্রথম বৎসর। এই বৎসর রবিউসসানি মাসে জোহর, আছর ও এশারের চার রাকাত ফরজ নামাজ ফরজ হয়েছে। প্রথমে দু'রাকাত নামাজ ফরয ছিল। মাগরিব ও ফজরের নামাজ পূর্বের নিয়মে অবশিষ্ট রয়েছে।[৯]

এর দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, নামাজ দু'দফা ফরজ হয়েছিল। প্রথম দু'রাকাত মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় মাগরিবের নামাজ ব্যতীত। অতঃপর চার রাকাত মদীনা মোনাওয়ারায় হয়েছিল, ফজর ও মাগরিব ব্যতীত। ফজর ও মাগরিবের নামাজ পূর্বের নিয়মে বর্তমান পর্যন্ত প্রচলিত রয়েছে।

মাছআলা: (২৪)

---

[৮]. **(الترياق النافع صفه ৫৬)**

[৯]. তাফরীহুল আজকিয়া ২য় খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা

নফল নামাজ জমাতে আদায়ের হুকুম দু'ভাবে বিদ্যমান– (১) সুন্নাত (২) গায়রে সুন্নাত (সুন্নাত নয়)।

النوافل من حيث طلب الجماعة قسمان ، الاوّل ماتسن فيه الجماعة كصلاة العيدين والكسوبين والتراويح والوترفى رمضان والاستسقاء ، والثانى مالاتسن فيه الجماعة وهو ماعدا ذلك – (تنوير صفه ١٧٢)

অর্থাৎ দুই ঈদের নামাজ (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা), চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণের নামাজ এবং তারাবীহ ও রমজান মাসে ভিতর নামাজ আর ইস্তিছকা অর্থাৎ বৃষ্টির জন্য নামাজ ইত্যাদি নামাজের জমাত সুন্নাত। উল্লেখিত নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নফল নামাজের জমাত গায়রে সুন্নাত।

মাছআলাঃ (২৫)

এশার নামাজ বিলম্বে পড়া মুস্তাহাব।

মাছআলাঃ (২৬)

নিজ আক্বীদা ও মছলকের খেলাফ তথা পরিপন্থীদের পিছনে নামাজ আদায় করা মাকরূহ।

كراهة الصلوة خلق المخالف حيث امكنه خلف غيرهم ومع ذالك الصلوة معهم افضل من الانفراد وتحصل له فضيلة الجماعة, وذكر الفاسق والمبتدع قال لان الصلوة خلف هؤلاء مكروهة مطلقًا. (الاشباه والنظائرمع شرح الحموى جلد-৪, صفحه ৩৭৮-৩৭৯)

মাছআলাঃ (২৭)

ফরজ কিংবা ওয়াজিব নামাজ আদায়কালীন যদি কেউ ডাকে তাহলে নামাজ ভঙ্গ করে ডাকে সাড়া দেওয়া কিংবা যাওয়া জায়েজ নাই। হ্যাঁ! হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দেওয়া ও যাওয়া ফরজ নামাজ হউক কিংবা ওয়াজিব বা যেই নামাজই হউক না কেন নামাজ ভঙ্গ করে যাওয়া ওয়াজিব এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হওয়াতে তার নামাজ ভঙ্গ হবে না।

আর যদি নফল নামাজ আদায়কালীন মা সন্তানকে ডাক দেয় তখন তাতে সাড়া দেওয়া ও যাওয়া ওয়াজিব, আর বাপের ডাকে যাওয়া জায়েজ নাই।[১০]

মাছআলাঃ (২৮)

নফল নামাজ জামাতে আদায়ের জন্য **تداعى** (ডাকা খোজা করা) মাকরূহ তানজীহি আর মাকরূহ তানজীহি হওয়ার ইল্লত ও কারণ **تداعى** নয়। কেননা চার অথবা চারের অধিক ব্যক্তি জামাত সহকারে নফল নামাজ আদায় করা হানাফী ফকীহগণের দৃষ্টিতে সাধারণত মাকরূহে তানজীহি।

এ ক্ষেত্রে **تداعى** হউক কিংবা না হউক। এর কারণ হানাফী ফকীহগণের মতে জামাত সহকারে নামাজ আদায় করা ফরজ ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ জন্য নফল নামাজ জামাতে আদায় করা মাকরূহ তানজীহি।

ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থে আছে–

ان الجماعة فى التطوع ليست بسنة (شامى جلد-১, صفحه ৬২৪)

নফল নামাজ জামাতে আদায় করা সুন্নাত নয়। হানাফী ফকীহগণের মতে নফল জামাত সহকারে আদায় করা মাকরূহ তানজীহি। তাহরীমি ও হারাম নয়। এ জন্য নফল নামাজ জামাতে আদায় করা জায়েজ নয়।[১১]

তবে বর্তমানে প্রেক্ষাপটে যেহেতু মানুষের মধ্যে অলসতা বৃদ্ধি পাওয়াতে শবে বরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ জামাতে আদায় করার ব্যাপারে মত পোষণ করেছেন।

(এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আমার রচিত, "আচ্ছালাতুত তা-তাউওয়ায়ু বেইকতেদায়ীল মুতাউয়ে" নামক কিতাবটি দেখুন)

মাছআলাঃ (২৯)

ফিতনা-ফাসাদের যুগে ইবাদত-বন্দেগীর ফজিলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে–

[১০]. শরহে মুসলিম শরীফ, ৭ম খন্ড, ৫৩পৃষ্ঠা
[১১]. শরহে মুসলিম, ৭ম খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা

হযরত মা'কর ইবনে ইয়াছার হতে বর্ণিত- হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

العبادة فى الهرج كهجرةٍ اِلىَّ

অর্থাৎ: ফিতনার যুগে ইবাদতের প্রতিদান আমার দৃষ্টিতে হিজরত করার সমপরিমান। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) হতে বর্ণিত- রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لاتقوم الساعة الاعلى شرار الناس

কিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে যখন কেবলমাত্র খারাপ লোক অবিশষ্ট থাকবে।

মাছআলা: (৩০)

নামাজ শবে মেরাজে ১৭ই রমজান তারিখে হিজরতের দেড় বছর পূর্বে ফরজ হয়েছে। আর মে'রাজের পূর্বে দু'ওয়াক্ত নামাজ ছিল। একটি হচ্ছে সূর্য্য উদয়ের পূর্বে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে।

তবে এক বর্ণনায় রমজান শরীফে মে'রাজ সংঘটিত হওয়ার কথা আছে। আরেক বর্ণনা মতে আছে মে'রাজ রজবের মধ্যে হয়েছিল। আর এটিই হচ্ছে সু-প্রসিদ্ধ ও সর্বসম্মত মতামত।[১২]

মাছআলা: (৩১)

যদি নামাজীর মাথার উপরে কিংবা ছাদের উপর ছবি (তাছ্বীর) ঝুলানো হয় অথবা নামাজীর আগে কিংবা নামাজীর ডানে-বামে অথবা সিজদার স্থানে ছবি থাকে, এ সমস্ত অবস্থায় নামাজ মাকরূহে তাহরীমি হবে। তেমনি স্থানে যদি কেউ নামাজ আদায় করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে অন্য স্থানে গিয়ে দ্বিতীয়বার নামাজ আদায় করা আবশ্য হবে। যেখানে সে বস্তু না থাকবে যার

[১২]. লুগাতুল কোরআন ৪র্থ খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা

দ্বারা নামাজ মাকরূহ হয়। নামাজীর পিছনে যদি ছবি হয় সেক্ষেত্রেও মাকরূহ হতে খালি নয়। তবে তা হবে সূক্ষ্ম ও হালকা মাকরূহ। অতএব নামাজ এরকম রুমে বা কামরায় আদায় করতে হবে যাতে নামাজীর সামনে, ডানে, বামে, উপরে এবং সিজদার স্থানে কোন প্রাণীর ছবি না হয়।

জ্ঞাতব্য যে, ছবি ছাপানো হউক কিংবা হাত দ্বারা অঙ্কিত হউক ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য। অর্থাৎ মাকরূহে তাহরীমি হবে। আর প্রাণহীন কোন ছবি কিংবা ফটো থাকলে নামাজ মাকরূহ সৃষ্টি করবে না। যেমন- স্থান, বিল্ডিং, দালান, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, গাছ, জমিন, আসমান ও বাগান ইত্যাদির ফটো। তেমনিভাবে ছবিযুক্ত টাকা, নোট, পয়সা, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র যদি নামাজির পকেটে অথবা ব্যাগের মধ্যে লুকায়িত বা গোপনীয় ভাবে হয়, সে সব ক্ষেত্রে নামাজের মধ্যে মাকরূহ (কারাহাত) সৃষ্টি হবে না।[১৩]

মাছআলাঃ (৩২)

মুখে শব্দ দ্বারা উচ্চারণে নিয়্যত করা মুস্তাহাব। জানা আবশ্যক যে, নামাজ বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে ছয়টি শর্ত বিদ্যমান। যেগুলো ব্যতীত নামাজ হবে না। যথা- (১) পবিত্রতা অর্জন (২) কাপড় দ্বারা ছতর আবরণ করা (৩) কেবলা মুখী হওয়া (৪) সময় হওয়া (৫) নিয়্যত করা (৬) তাকবীর বলা। নিয়্যত অন্তরের পরিপূর্ণ ও পাক্কা ইচ্ছাকে বলা হয়। মুখ দ্বারা নিয়্যতের শুদ্ধ উচ্চারণ করা মুস্তাহাব **(بدعت مستحبه)** নিয়্যতের সর্বনিম্ন স্থর হচ্ছে- সে সময় যদি কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে আপনি কোন নামাজ আদায় করতেছ, তখন কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা ও ইতস্ত না করে বলে দেওয়া যে, আমি ফজর কিংবা জোহর বা আছরের নামাজ আদায় করতেছি। তবে অধীক এহতেয়াদ তথা সাবধানতা হচ্ছে তাকবীরে তাহ্‌রীমা আল্লাহু আকবর বলার

[১৩]. আলমগীরি, দুররে মোখতার, ফতোয়ায়ে বরকাতুল উলুম ইত্যাদি

সময় অন্তরে এই নিয়্যত বিদ্যমান থাকা যে- আমি ফজর কিংবা জোহরের নামাজ আদায় করতেছি।

মাছআলাঃ (৩৩)

সুন্নাত নামাজ সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান সুন্নাত হচ্ছে ফজরের সুন্নাত। এমনকি উক্ত সুন্নাতকে কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রয়েছে- ফজরের সুন্নাত তরক করিওনা, যদিওবা তোমাদের উপর শত্রুর ঘোড়া এসে যায়। এর পরের স্তর হচ্ছে জোহরের সুন্নাত।

মাছআলাঃ (৩৪)

ফজরের নামাজ ক্বাজা হলে সূর্য্য হেলে যাওয়ার পূর্বে আদায় করে নেবে, সাথে সুন্নাত আদায় করবে। আর যদি ফরজ আদায় করা হয়েছে কিন্তু ফজরের সুন্নাত ক্বাজা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে সুন্নাতের ক্বাযা নাই। তবে সূর্য্যের কিরন উজ্জ্বল্য হওয়ার পর আদায় করে নেয়া উত্তম।

মাছআলাঃ (৩৫)

জোহর কিংবা জুমার ফরজ নামাজের পূর্বকার সুন্নাত ফওত (অনাদায়ী) হয়ে গেলে এক্ষেত্রে ফরজ আদায় করার পর সময় অবশিষ্ট থাকলে ফরযের পর আদায় করে নেবে। আর এতে উত্তম হচ্ছে ফরজের পরবর্তী সুন্নাত আদায় শেষে ফওত (অনাদায়ী) হয়ে যাওয়া সুন্নাত আদায় করা।

মাছআলাঃ (৩৬)

জামাত আরম্ভ হওয়ার পর কোন নফল কিংবা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা আরম্ভ করা জায়েজ নাই, কেবলমাত্র ফজরের সুন্নাত ব্যতীত। যখন সে জানতে পারবে যে, সুন্নাত আদায় শেষে জামাতে শরীক হতে পারবে, শরীক হওয়াটা যদিওবা শেষ বৈঠকে অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতুর মধ্যে হউক, সে ক্ষেত্রে সুন্নাত পড়ে নেবে। আর এই নামাজ এমন স্থানে আদায় করবে তার (নামাজ

আদায়কারী) এবং জামাতের কাতারের মধ্যবর্তী আড়াল হয়। কাতার বরাবর কিংবা কাতারের পিছনে যেন না হয়।[১৪]

মাছআলাঃ (৩৭)

সুন্নাত ও ফরজ নামাজের মধ্যবর্তী কথাবার্তা দ্বারা সুন্নাত বাতেল হবে না। তবে ছাওয়াবের ক্ষেত্রে কমতি হবে। কারণ ব্যতীরেকে ফরজের পরবর্তী সুন্নাত দেরীতে আদায় করা মাকরূহ। যদিওবা আদায় হয়ে যাবে।

মাছআলাঃ (৩৮)

চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাতে মোয়াক্কাদার প্রথম বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার পর যদি ভুলবশতঃ দরূদ শরীফ পড়া হয়। সেক্ষেত্রে ছহু সিজদা করবে।

মাছআলাঃ (৩৯)

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ব্যতীত অপরাপর সুন্নাত যেমন- গাইরে মুয়াক্কাদা, নফল, মান্নাতের নামাজ ইত্যাদি চার রাকাতের নিয়্যতে আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং তৃতীয় রাকাতের জন্য যখন দন্ডয়মান হবে তখন সুবহানাকা (ছানা) এবং আউযু বিল্লাহ পাঠ করবে।[১৫]

মাছআলাঃ (৪০)

দাঁড়িয়ে নফল নামাজ আদায় করার উপর শক্তি সামর্থ হওয়ার পরও বসে নফল নামাজ আদায় করা যাবে তবে দাঁড়িয়ে আদায় করা উত্তম।

মাছআলাঃ (৪১)

নফল নামাজ বসে আদায় করার ক্ষেত্রে এমন ভাবে বসতে হবে যেমনভাবে তাশাহুদে বসা হয় এবং রুকু করার সময় এমনভাবে ঝুকতে হবে। যেন মাথা হাটু বরাবর হতেও সামান্য বেশী ঝুকবে।

মাছআলাঃ (৪২)

[১৫]. (হামারা ইসলাম-পৃষ্ঠা-২৫৯)

قوله تعالى إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থাৎ: নামাজ যাবতীয় অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ হতে বিরত রাখে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) এরশাদ করেছেন- যার নামাজের মাধ্যমে তাকে ভাল ও সৎ কাজের হুকুম না করবে এবং খারাপ কাজ হতে বিরত না করবে, তার নামাজ আল্লাহ হতে অনেক দূরে সরে দিবে। হযরত কাতাদাহ ও হযরত হাসন বছরী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন- এ ধরণের নামাজ তার জন্য অভিশপ্ত। জনৈক ব্যক্তি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা:)'র নিকট আরজ করছেন, যে অমুক ব্যক্তি চুরি করে থাকে অথচ সে একজন নামাজী, এর জবাবে হযরত জাবের (রা.) বলেন- তার নামাজের দ্বারা যে কোন সময় তার চুরি অভ্যাস পরিত্যাগ করাবে।

পাঠকগণ! পরীক্ষিত যে বেনামাজী ব্যক্তি অতীব লজ্জাহীন হয়ে থাকে। আর বেনামাজী ব্যক্তি নামাজী ব্যক্তি হতে গোনাহ বেশী করে থাকে। আর নামাজ পরিহার করা এবং নিজ মালিকের হুকুম ও নির্দেশ অমান্য করা সমস্ত গোনাহ হতে বড় গোনাহ এবং সমস্ত বেহায়া ও লজ্জাহীনতার চেয়েও বড় ও কঠিন বেহায়াপনা।[১৬]

মাছআলা: (৪৩)

সিজদা সাহু করার পদ্ধতি হল, শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে ডানে সালাম দিয়ে দু'টি সিজদা করবে (তা ভুলের পাথর শয়তানের জন্য) অত:পর তাশাহুদ পূর্ণ করবে এবং দরূদ শরীফ দু'আ পড়ে সালাম ফিরাবে। এভাবে সিজদা সাহু দিলে নামায পরিপূর্ণ হবে।

মাছআলা: (৪৪):

[১৬]. তাফসীরে সূরা আলাম নাশরাহ কৃত-আল- ামা নক্বী আলী খান সাহেব, পৃষ্ঠা-৩৩৮

কোন ব্যক্তি এমন স্তরে পৌঁছতে পারে না যে ব্যক্তির উপর নামায, রোযা ইত্যাদি পড়তে হয় না। নবীর চেয়ে বড় আর কে আছে তার থেকে পর্যন্ত তা রহিত হয়নি।

মাছআলাঃ (৪৫)ঃ

কসর নামাযের কাযার পদ্ধতি। যদি সফরের অবস্থায় কোন নামায কাযা হয় এবং ঘরে পৌঁছে সে তা পড়ে নেয় তখন তাকে কসর পড়তে হবে, তেমনি যদি কোন নামায ঘরে কাযা হল তখন সফরে যদি তা আদায় করতে চায় তখন পুরোভাবে পড়বে।[১৭]

মাছআলাঃ (৪৬)ঃ

নামাযের সময় আগে বা পেছনে কাপড়কে উচুঁ করা এবং কাপড়কে মাটি থেকে বাঁচানোর জন্য গোছিয়ে নেওয়া মাকরূহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা চুল পরিমান কাপড় উঠাওনা নামাযে।

নামাযরত অবস্থায় কপালের চুলকে মাটি থেকে বাঁচানোর জন্য তোলা বা মুখ দ্বারা আশপাশের মাটিকে ফুঁক দেওয়া মাকরূহ। যদি সিজদার স্থানে কঙ্কর থাকে তখন তা সরিয়ে দেওয়ার জন্য একবার দুবার ফুঁক দেওয়া বৈধ।[১৮]

মাছআলাঃ (৪৭)

নামাযরত অবস্থায় আঙ্গুল মটকানো বা এক হাতের আঙ্গুলকে অন্য হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করানো মাকরূহ।

মাছআলাঃ (৪৮)

কোমরে হাত রাখা প্রয়োজন বিহীন এবং নামাযে মুখ ফিরানো মাকরূহ। চোখে ডানে বামে দেখাতে অসুবিধে নেই। তবে গর্দান ফিরানো বৈধ নয়।

মাছআলাঃ (৪৯)

---

[১৭]. ইসলামী ফিকাহ:১৬২

[১৮]. ইসলামী ফিকাহ।

নামাযের সময় হাতে ইশারা করা সম্মুখে কোন গমনকারীকে বাঁধা দেওয়া ব্যতীত মাকরূহ।

মাছআলাঃ (৫০)

মাথার পেছনের চুলকে জোট বেধে নামায পড়া মাকরূহ।

মাছআলাঃ (৫১)

সূরা ফাতেহা বা অন্য সূরা রুকুতে শেষ করা মাকরূহ।

তেমনি রুকুতে গিয়ে আল্লাহু আকবর বলা মাকরূহ বা পুরোপুরি দাঁড়িয়ে সামিয়াল্লাহু বলা উচিত নয়। এ দু'টি শব্দ রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে উঠার মাঝখানে পড়া উত্তম।

মাছআলাঃ (৫২)

ঘড়ি ও ক্যালেন্ডারের ব্যবহার আগে থেকে ছিল কিন্তু নামাযের জন্য তার ব্যবহার ছিল না। বর্তমানে স্থায়ী ক্যালেন্ডারে সময়ের যে নির্ধারণ রয়েছে তা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অংশ; কিন্তু বর্তমানে দূরবীণ ও অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি আকিষ্কারের ফলে তা আরো অগ্রগতি লাভ করেছে। তা মতে আমাদের ঘড়ির সময় চলে তাই আলিমগণ তদন্ত সাপেক্ষে যে ক্যালেন্ডার তৈরী করেছে তা সঠিক। তা ব্যবহারে শরীয়তে বাধা নেই। বরং মহান আল্লাহ যুগের পরিবর্তনের সাথে তার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান। যাতে বান্দাহ বিভিন্ন প্রকার সুবিধা অর্জন করতে পারে। তাই তা নামাযের সময়ের জন্য খুব মঙ্গলজনক। তাই তা দ্বারা সফর ও ইকামতের সাহায্য নেওয়া বৈধ।[১৯]

মাছআলাঃ (৫৩)

বিমানে নামায পড়ার পদ্ধতি হল, কিতাবুল ফিকাহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আতে এসেছে, যদি নৌকায় দাড়ানো মাত্র পড়ে যাওয়ার আশংখা থাকে বা দাড়ানোর কোন পদ্ধতি না থাকে তখন বসে বসে নামায আদায় করবে, তেমনি যদি বিমানে বসে পড়তে পারে তখন বসে পড়বে। কেননা

[১৯]. ইসলামী ফিকাহ

নৌকায় যেমন কপাল মাটিতে লাগে না তেমনি বিমানেও কপাল মাটিতে লাগে না। তবে সে যে বস্তুর উপর সিজদা করবে তা যমীনের হুকুমে হবে।[২০]

মাছআলা: (৫৪)

قوله عليه السلام: هذا وقت الأنبياء من قبل الخ

অর্থ: এটি ইতিপূর্বের সকল নবীদের সময় ছিল:

এ থেকে বুঝা যায়, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পূর্বের উম্মতের মাঝেও ছিল অথচ বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায শুধুমাত্র এ উম্মতের বৈশিষ্ট্য ছিল। তখন তার জবাব হল পাঁচ ওয়াক্ত নামায যদিও পূর্বের উম্মতের উপর ফরয ছিল না, সম্ভব হতে পারে তা নবীদের উপর ফরয ছিল বা তারা নফল হিসাবে তা আদায় করতেন এসকল সময়ে বা এই সাদৃশ্যতা ওয়াক্ত নির্ধারণে সময়ে নয়।

দ্বিতীয় উত্তর হল, যদিও পাঁচ ওয়াক্ত নামায পুরোপুরিভাবে কোন উম্মতের উপর এককভাবে ফরয ছিল না; কিন্তু তা সমষ্টিগতভাবে বা এক এক উম্মতের উপর এক এক নামায ফরয ছিল। তাই ইমাম আবু জাফর তাহাবী বলেন, হযরত আদম (আ:) এর তাওবা ফযরের সময় কবুল হয়েছে; তাই তিনি শোকর আদায় স্বরূপ দু'রাকাত নামায পড়েছেন যা ফযরের নামাযের মূল এবং যখন হযরত ইসমাইল এর ফিদিয়াতে দুম্বা যবেহ হল, তা যোহরের সময় ছিল তখন হযরত ইব্রাহীম (আ:) চার রাকাত যোহরের নামায আদায় করলেন এবং হযরত ওযাইর (আ:)কে দ্বিতীয়বার আসরের সময় জীবিত করা হয়েছে, তখন তিনি আসরের সময় চার রাকাত নামায আদায় করেছেন এবং হযরত দাউদ (আ:)-এর তাওবা মাগরিবের সময় কবুল করা হয়েছে তখন তিনি চার রাকাত শুরু করেছেন। তিনি অধিক

[২০]. ফিকহে ইসলামী।

ক্রন্দন আসার কারণে চতুর্থ রাকাত পড়তে সক্ষম হননি। তিন রাকাতে সালাম ফিরালেন। তাই মাগরিবের নামায তিন রাকাত হয়েছে এবং ইশার নামায উম্মতে মুহাম্মদী ছাড়া আর কেউ পড়েননি। তাই হাদিসের মর্মার্থ হল, যার উপর যে নামায ছিল তার সময় এটাই ছিল। তাই এখানে নবীদের দিকে সমষ্টিগতভাবে সম্পর্ক করা হয়েছে বা প্রত্যকের ভিত্তিতে নয়।[২১]

মাছআলাঃ (৫৫)

নামাযে ক্বেরাত পড়ার হুকুম।

কিরাতের তিন পদ্ধতিঃ

১. তেওয়ালে মুফাস্সালঃ অর্থাৎ কোরআন মজীদের ছাব্বিশ পারার সূরা হুজরাত থেকে ত্রিশ পারার সূরা বুরুজ পর্যন্ত সূরাকে বলা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় ফজর ও যোহরে এ থেকে পড়তেন।

২. আউসাতে মুফাস্সালঃ সূরা তারেক থেকে সূরা লাম ইয়াকুন পর্যন্ত তের সূরাকে বলা হয়। আছর ও এশার নামাযে তা থেকে পড়া উত্তম।

৩. কেসারে মুফাস্সালঃ সূরা ইযা যুলযিলা থেকে শেষ পর্যন্ত যত সূরা রয়েছে তাকে কেসারে মুফাস্সাল বলা হয়। মাগরিবের নামাযে তা থেকে পাঠ করা হয়।[২২]

আজানের বর্ণনা

মাছআলাঃ (৫৬)

আজানের আগে পরে দরূদ শরীফ ও সালাত সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব ও মুস্তাহাসান। বর্তমান ফিত্না ফ্যাসাদের যুগে দরূদ শরীফ এটি একটি

[২১]. দরসে মেশকাত:খ, ২ পৃ:১৬
[২২]. মালাবুদ্দাহ

মাপকাঠি। কেননা, এটি বিশুদ্ধ আক্বীদাপন্থী লোকদের মসজিদ কিনা। অর্থাৎ আজানের আগে পরে দরূদ শরীফ পাঠ করলে বুঝা যাবে এটি বিশুদ্ধ আক্বীদার মসজিদ। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আমি অধমের লিখিত:

الصلواة على النبى الامين قبل الاقامة والتاذين

নামক কিতাব যা আজানের আগে দরূদ পড়া জায়েয নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে এটি মাজ্‌মুয়ায়ে রাসায়েল নামক কিতাবের মধ্যে বিদ্যমান। উক্ত কিতাবটি পাঠ করার অনুরোধ রইল।

উল্লেখ্য যে আজানের আগে-পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা নজদী হুকুমতের পূর্বে পবিত্র হারামাইন শরীফেও প্রচলন ছিল।

كما بسطه فى كشف الارتياب

মাছআলা: (৫৭)

মসজিদের অভ্যন্তরে আজান দেওয়া মাকরূহ।[২৩]

মাছআলা: (৫৮)

যদি আজানের জন্য মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট থাকে আর তার অনুমতিক্রমে কোন ব্যক্তি আজান দিয়ে থাকলে এক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি একামত দিতে হবে এমন কোন আবশ্যকতা নাই। যে ব্যক্তি আজান দিয়েছে সে যদি উপস্থিত না থাকে অন্য যে কেউ একামত দিতে পারবে। আর যদি মুয়াজ্জিন উপস্থিত থাকে তবে এক্ষেত্রে তার অনুমতিক্রমে যে কেউ একামত দিতে পারবে। আর মুয়াজ্জিনের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কেউ আজান দেওয়াতে মুয়াজ্জিন যদি অসন্তুষ্টি কিংবা মনে কষ্ট পায় তবে এক্ষেত্রে মাকরূহ হবে, এমনটি না হলে অসুবিধা হবে না।[২৪]

---

[২৩]. দুররে মোখতার।

[২৪]. আলমগীরি, বরকাত

মাছআলাঃ (৫৯)

আজানের মধ্যে রাগিনী তথা সঙ্গীতের সূর ভঙ্গী, সূর বৈচিত্র যা বাক্যকে পরিবর্তন করে দেয় অর্থাৎ অক্ষরে হরকত, সুকনাতের ক্ষেত্রে কম বেশী হয়ে যায়। যেমন হরফ কিংবা **مدّ اول** (প্রথম মদ্দ) ও **مدّ اخر** (দ্বিতীয় মদ্দ) হতে বাড়িয়ে বলা এ সমস্ত কিছু করা এবং শ্রবণ করা উভয়ই হালাল নয়। যেমনটি কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে হালাল নয়।

দুররে মোখতারে আছে;

(ولا لحن فيه) اى التغنى بغير كلماته قانه لايحل فعله وسماعه لاتغنى بالقرآن -

অনুরূপ রদ্দে মোখতারে বর্ণিত রয়েছেঃ

قوله (بغير كلماته) اى بزياده حركة وحرف اومد او غيرها فى الاوائل والاخر (فتوى سعديه صفه ২৪)

মাছআলাঃ (৬০)

জারজ সন্তানের আজান জায়েজ এবং জারজ সন্তান হওয়ায় তার আজান মাকরূহ হবে না।[২৫]

ويجوز اذان العبد والقروى واهل المفازة وولد الزناء الى ان قالوا من غير كراهة

মাছআলাঃ (৬১)

নামাজের আজান ব্যতীত অন্যান্য আজানের জবাব দেওয়া কেমন? বলা যায়- আজান শ্রবণ সম্পর্কীয় হাদীস যাতে আজান শ্রবণ পূর্বক জবাব দেওয়ার বর্ণনা রয়েছে। উক্ত হাদীসটি আ'ম তথা সর্ব সাধারণ যা কার্য্যতঃ বাহ্যিকভাবে সে সমস্ত আজানের জবাব দেওয়ার কথাও প্রমাণিত রয়েছে যে

[২৫]. ফতোয়ায়ে আলমগীরি, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮

সমস্ত আজান নামাজ ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন- নবজাত শিশুর জন্মের পর আজান, ইত্যাদি।[২৬]

بقى هل يجيب اذان غير الصلواة كالاذان للمولود لم اراه لانمتنا والظاهر نعم ولذا يلنتت فى حيعلته كما وهو طاهر الحديث ويظهر لى اجابة الكل بالقول لتعدد السبب وهو السماء.

এটি সর্ব সাধারণের ক্ষেত্রে দলিল।

والطاهر وجوبها باللسان لظاهر الامر فى حديث اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الخ.

বাহরুর রায়েক্ব ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে–

সাধারণত: আল্লাহর জিকিরের সৌন্দয্যের বর্ণনা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। প্রতিটি কর্মের সুনির্দিষ্টতা শরীয়ত দ্বারা ছাবেত হওয়া আবশ্যক নয়। তবে পায়খানায় বসে মুখ দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা নিষেধ, কেননা এই সুনির্দিষ্ট কর্মের অপরিণাম সম্পর্কে শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত।[২৭]

মাছআলা: (৬২)

আযান বুদ্ধিমান বালেগ ব্যক্তিরা দিবেন, পাগল অবুঝ শিশু দ্বারা আযান দেওয়া বৈধ নয়। তেমনি মহিলাদের আযান দেওয়া মাকরূহে তাহরিমী। তাই কোন মহিলা বা পাগল বা বেহুঁশ ও অবুঝ শিশু আযান দিলে তা পুনরায় বলতে হয়।[২৮]

মাছআলা: (৬৩)

টেপ রেকর্ডের আযানের জবাব দেওয়ার হুকুম:

যখন সে আযান শরয়ী নয় তখন তার জবাব কিসের; বরং তা সুন্নাতের বিপরীত। তা বিদ'আত হওয়াতে কারো সন্দেহ নেই। আযানের জবাব শরয়ী হলে দিতে হয়।

---

২৬. ফতোয়ায়ে শামী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬৯

২৭. ফতোয়ায়ে নুরীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮৩

২৮. ইসলামী কানুন

মাছআলাঃ (৬৪)

সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা ঐ কাজকে বলা হয়, যা নবীর সামনে সাহাবারা করেছেন তিনি নিশ্চুপ ছিলেন বা খুশি প্রকাশ করলেন এবং নিষেধ করেননি তাই সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা। যেমন, হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে প্রমাণিত, আযানে পবিত্র নাম শুনে দরূদ শরীফ পড়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুমু খাওয়া সুন্নাত। তা অস্বীকারকারী মুহাব্বাত বঞ্চিত।

(এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য আমার লিখিত "তাকবীলুল ইব্হামাইন" নামক পুস্তিকাটি পাঠ করার অনুরোধরইল।)

মাছআলাঃ (৬৫)

আযান শেষ হওয়ার পরে মুয়াজ্জিন ও শ্রোতা দরূদ শরীফ পড়বে অতঃপর দু'আ করবে।

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ. آتِ سيدنا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، والدرجة الرفيعة وَابْعَثْهُ ن امَقَامَا محْمُودَا الَّذِي وَعَدْتَهُ و ارزقنا شفاعته و اجعلنا فى شفاعتيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.[২৯]

মাছআলাঃ (৬৬)

আযানের দু'আতে হাত উঠার কি হুকুম?

আযানের দুআতে হাত উঠানো সুন্নাত।

মাছআলাঃ (৬৭)

খুতবার আযানের জবাব মুক্তাদীকে দেওয়া বৈধ নয়।[৩০]

মাছআলাঃ (৬৮)

[২৯]. সগীরি, কবীরি, শামী, বাহারে শরীয়ত, খ, ৩ পৃঃ৩৭, রাহে নাজাত, রুহুল ঈমান ও ইসলাম, পৃঃ৩৪।
[৩০]. বাহারে শরীযয়, দুররে মুখতার, ফতোয়ায়ে সিরাজিয়া।

ইকামতের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। তার জবাবের পদ্ধতিও আযানের মত। পার্থক্য হল, **قد قامت الصلوة** এর জবাবে **أقامها الله و ادامها** বলবে।[৩১]

মাছআলাঃ (৬৯)

নামাযের আযান ব্যতীত অন্য আযানেরও জবাব দিতে হয়। যেমন বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরের আযান।[৩২]

মাছআলাঃ (৭০)

যদি কয়েকটি আযান শুনা হয় তখন সকলের জবাব দেওয়া উত্তম হবে, তবে প্রথম আযানের জবাব দেওয়া সুন্নাত হবে।[৩৩]

মাছআলাঃ (৭১)

মুয়াজ্জিন কিরকম হওয়া চায়? যেহেতু আযানের উপর নামায রোযার ভিত্তি। তাই মুয়ায্যিন এমন হওয়া চায় যে নামাযের সময় নিয়ে অবগত, বুদ্ধিমান, সতর্কবান মুত্তাকী হয়। সাথে সাথে সে আযানের আদব সুন্নাত নিয়ে অবগত। ফাসেকও ফাজের হবে না। তাই যে দাড়ি রাখেনা ও বিভিন্ন প্রকাশ্য পাপে লিপ্ত তার আযান মাকরূহ। হাদিসে এসেছে, তোমাদের মাঝে তোমাদের উত্তম ব্যক্তি আযান দিবে।[৩৪]

অজুর বর্ণনা

মাছআলাঃ (৭২)

অজুর চার ফরযঃ (১) মুখ ধৌত করা। কপালের চুলের গোড়া হতে দাঁড়ি উঠার জায়গা অর্থাৎ থুথুনির নিচে পর্যন্ত আর এক কানের লতি হতে অপর

---

৩১. বাহারে শরীয়ত, আরমগিরী
৩২. শামী, বাহারে শরীয়ত।
৩৩. শামী, বাহারে শরীয়ত।
৩৪. আলমগিরী

কানের লতি পর্যন্ত ধৌত করা। (২) উভয় হাত কনু পর্যন্ত ধোয়া। (৩) মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাছেহ করা। (৪) উভয় পা উপরের গোড়ালি পর্যন্ত ধোয়া।

মাছআলা: (৭৩)

অজুর মধ্যে সুন্নাত হচ্ছে-১৫টি:

(১) নিয়্যত করা, অন্তর কিংবা মুখ দ্বারা অর্থাৎ আমি ওজু করতেছি নাপাকি ও অপবিত্র দুরীভূত হওয়ার জন্য এবং নামাজ ও অপরাপর ইবাদত জায়েয হওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করার নাম হচ্ছে নিয়্যত। আস্তে আস্তে কিংবা চুপে চুপে বলাও জায়েয। (২) **بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ, اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلْاِسْلَامُ نُـوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَـةٌ-** পাঠ করা। (৩) উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া। (৪) তিন বার কুলি করা। (৫) মিসওয়াক করা, অপারক অবস্থায় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা মাজা। (৬) তিনবার নাকে পানি দেওয়া অর্থাৎ পানি দ্বারা নাক পরিস্কার করা। (৭) দাঁড়ি খেলাল করা। (৮) উভয় হাত ও পায়ের আঙ্গুল সমূহ খেলাল করা। (৯) প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিন বার করে পর পর ধোয়া। (১০) সমস্ত মাথা মাছেহ করা। (১১) তারতীব হিসাবে অজু করা অর্থাৎ প্রথমে মুখ অতঃপর উভয় হাত ইত্যাদি তারতীব ও নিয়ম হিসাবে আদায় করা। (১২) উভয় কান মাছেহ করা। (১৩) অজু করার সময় একটি অঙ্গ শুকাবার আগে আগে অন্য আরেকটি অঙ্গ ধৌত করা। অর্থাৎ পর পর ধৌত করা। (১৪) অঙ্গ ধৌত করার সময় ডান দিক হতে অজুর কাজ আরম্ভ করা। (১৫) প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করার সময় খেয়াল রাখতে হবে কোন অঙ্গের মধ্যে যেন চুল পরিমাণও শুকনা না থাকে।

মাছআলা: (৭৪)

অজুর মুস্তাহাব ১৬টি: যথা- (১) কিবলার দিকে মুখ করে বসা। (২) ডান দিক হতে অজুর কাজ আরম্ভ করা। (৩) কুলি করার সময় এই দোয়া পাঠ করা **اللهم لَقِّنِي حُجَّتِيْ بِالْاِيْمَانَان** অর্থাৎ হে আল্লাহ! ঈমানের সাথে আমার

দলিল আমাকে শেখাও। (৪) মিসওয়াক করার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা **اللهم استطعمك من طعام الجنّة** অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জান্নাতের খানা প্রার্থনা করছি। (৫) নাকের মধ্যে পানি দেওয়ার সময় এই দোয়া পাঠ করা **اللهم لا تحر منى رائحة الجنة وارحنيى الجنّة** অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমার জন্য জান্নাতে সুঘ্রাণ (খোশবু) হারাম করিও না এবং আমাকে জান্নাতের সুঘ্রাণ দান করুন। (৬) মুখ ধোয়ার সময় পাঠ করবে **اللهم بيض وجهى يوم تبيض وجوه اوليائك ولاتسود وجهه يوم لاسود وجوه ادأبك اللهم نور بنور معرفتك** অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমার মুখ সাদা ধবধবে কর, যে দিন সাদা হবে তোমার নৈকট্যবানদের মুখ এবং কাল ও মলিন কর না আমার মুখ। যে দিন মলিন হবে তোমার দুশমনদের মুখ। হে আল্লাহ উজ্জ্বল্য করুন আমার মুখ তোমার মারেফতের রৌশনী ও উজ্জ্বল্য দ্বারা। (৭) ডান হাত ধোয়ার সময় পাঠ করবে- **اللهم اَعْطِنِىْ كِتَابِىْ بِيَمِيْنِىْ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا** অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমার কিতাব তথা আমলনামা ডান হাতে দান করুন এবং আমার হিসাব-নিকাশ সহজতর করুন। (৮) বাম হাত ধোয়ার সময় বলবে- **اللهم انّى اعوذبك ان تعطينى كتاب بشمالى لا تجعلها مغلولة الى عنقى** অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি যে, তুমি আমার আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হতে এবং তা আমার গরদানের উপর ঝুলা হতে। (৯) হাতের মধ্যে আংটি থাকে সেক্ষেত্রে আংটি যদি ঢিল হয় তাহলে নেড়ে দেওয়া এবং আঙ্গুলের সাথে শক্তভাবে মিলিত হলে তা বের করা। (১০) মাথা মাছেহ করার সময় নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা- **اللهم غشنا برحمتك فانا نخشى عذابك, اللهم لا تجمع بين نواصينا واقدامنا** অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমাকে তোমার রহমতে ভরপুর করে দাও। আমি ভয় করছি তোমার শাস্তি হতে। হে আল্লাহ! আমার পা কপালের সাথে মিলিত কর না। (১১) গরদান মাছেহ করা। (১২) গরদান মাছেহ করার সময় পাঠ করবে- **اللهم نجنا من**

مقطعات النيران وفك رقبتى من النار অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আগুনের অগ্নিশিখা হতে আমাকে হেফাজত করুন এবং আমার গরদান দোযখ হতে পরিত্রাণ করুন। (১৩) পা ধৌত করার সময় পাঠ করবে; **اللهم ثبت قدمى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام, اللهم كما طهرتنا من الماء فطهرنا من الذنوب** অর্থাৎ: হে আল্লাহ! পুলসিরাত পাড় হওয়ার সময় আমার পা অবিচল ও স্থির রাখুন, যে দিন স্থির থাকার নয়। যেমনি ভাবে তুমি আমাদেরকে পানি দ্বারা পবিত্র করেছেন, তেমনি ভাবে পাক পবিত্র করে দাও গোনাহ্ হতে। অতঃপর ১ বার আয়াতুল কুরসি, ১ বার সূরায়ে ক্বদর (ইন্না আন্জালনা) পাঠ করা অনেক ছাওয়াব বিদ্যমান।

হযরত শাইখ আ'রেফ বিল্লাহ আবুল হাসান বকরী (রহঃ) নকল করেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন:

من قرأنى اثر الوضوء انا انزلناه فى ليلة القدر مرّةً واحدةً كان من الصديقين ومن قراء مرتين كتيب من ديوان الشهداء ومن قراء ثلاثًا حشره الله محشر الانبياء اخرجه الديلمى فى مسند الفردوس.

وقال الفقيه ابو الليث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم انه قال من قراء انّا انزلناه على اثر الوضوء اعطاه الله ثواب عبادة خمسين سنة صيام نهارها وقيام ليلها, ومن قرأها مرتين اعطاه الله تعالى اعطنى الخليل والكليم والرفيع الحبيب ومن قرأها ثلاثًا يفتح الله له ابواب الجنّة الثمانية فيد خلُها من اى باب شاء بلاحساب ولا عذاب.

وقال صلّى الله عليه وسلّم قرائه انّا انزلنه فى ليلة القدر تعدل ربع القران[৩৫]

অর্থাৎ: হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি অজু পরিপূর্ণ করার সাথে সাথে একবার সূরায়ে ক্বদর পাঠ করবে, সে

[৩৫]. **(امداد الفتاح, صفحه ৮৫)**

ব্যক্তি ছিদ্দিকগণের মধ্যে পরিগণিত হবে আর যে ব্যক্তি সূরায়ে ক্বদর ২ বার পাঠ করবে শহীদগণের তালিকায় সে অন্তর্ভূক্ত হবে, আর যেই ব্যক্তি সূরায়ে ক্বদর ৩ বার পাঠ করবে আল্লাহ্পাক আম্বিয়াদের সাথে তাকে হাশর করাবেন।

ইমাম ফকিহ আবুল লাইছ বলেন; হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি ওজু শেষ করার সাথে সাথে সূরায়ে ক্বদর ১ বার পাঠ করবে আল্লাহপাক তাকে অনেক ছাওয়াব দান করবেন। সারাদিন রোজা রাখা আর সারা রাত জেগে ইবাদত তথা নামাজ পড়া এ ধরণের পঞ্চাশ বছর ইবাদতের ছাওয়াব আল্লাহপাক তাকে দান করবেন। আল্-হামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য)

আর যে ব্যক্তি সূরায়ে ক্বদর ২ বার পাঠ করবে আল্লাহপাক তাকে বখশিশ করবেন খলিল, কালিম, রফীঈ হযরত ইদ্রিছ (আ:) ও ঈসা (আ:) এবং হাবিবের সমপরিমাণ মর্যাদা ও ছাওয়াব। আর যে ব্যক্তি সূরায়ে ক্বদর ৩ বার পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা অবমুক্ত (খুলে) করে দিবেন, সে ব্যক্তি যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা হিসাব-নিকাশ ও শাস্তি ব্যতিত বেহেশতে প্রবেশ করবে।

হাদীস শরীফে রয়েছে যে ব্যক্তি সূরায়ে ক্বদর পাঠ করবে তার জন্য এক চতুর্থাংশ কোরআন শরীফ পাঠ করার ছাওয়াব নিহিত। সুব্হানাল্লাহ! কি ধরনের ফজিলত ও মর্যাদাপূর্ণ এবং বরকতময় সূরা।[৩৬]

(১৪) অজু সমাপ্তির পর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ শেষে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া–

اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين واجعلنى من عبادك الصالحين.

[৩৬]. সূরায়ে ক্বদর।

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন এবং পাক-পবিত্রময় ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত করুন, আর নেক বান্দাদের দলভূক্ত করুন।

(১৫) প্রতিটি ফরয অঙ্গ ধোয়ার সময় কালেমায়ে শাহাদাত এবং দরূদ শরীফ পাঠ করা। (১৬) প্রতিটি নামাজের জন্য নতুনভাবে ওজু করা। যদিওবা ওজু থাকে। এছাড়াও অজুর আরোও অনেক মুস্তাহাব রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য মুস্তাহাব সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

মাছআলা: (৭৫)

অজুর মধ্যে মাকরূহ হচ্ছে ১৭টি: যথা- (১) বাম দিক হতে অজু আরম্ভ করা। (২) বাম হাতে মুখে পানি লওয়া বা পানি ঢালা। (৩) বাম হাত দ্বারা নাকে পানি নেওয়া। (৪) ডান হাত দ্বারা নাক পরিস্কার করা। (৫) মুখের মধ্যে পানি জোরে মারা। (৬) মুখ ধোয়ার সময় ওষ্ঠ এবং চোখ শক্ত ভাবে বন্ধ রাখা। (৭) অজুর পানির মধ্যে থুথু ফেলা। (৮) অজু করার সময় দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা। (৯) প্রতিটি অঙ্গ ৩ বারের কম ধোয়া। (১০) প্রতিটি অঙ্গ ৩ বারের অধিক ধোয়া। (১১) ২ কিংবা ৩ বার মাথা মাছেহ করা ইমাম আজমের মতে মাকরূহ। ইমাম শাফেয়ীর মতে জায়েয। (১২) অপবিত্র ও নাপাকময় স্থানে অজু করা। (১৩) ইস্তিঞ্জার (প্রশ্রাবের) স্থানে অজু করা। (১৪) তামার বাসন কিংবা তামার পেয়ালার পানি রৌদ্র কিংবা তাপের কারণে গরম হওয়া পানি দ্বারা অজু করা। (১৫) নিজের অজুর জন্য বদনা কিংবা পাত্র নির্দিষ্ট করা এবং ঐ বদনা দিয়ে অন্য কাউকে অজু করতে না দেওয়া। (১৬) নিজের লজ্জাস্থান নিজে দেখা। (১৭) অতিরিক্ত রং দ্বারা রঞ্জিত তামার বদনা দ্বারা অজু করা ইত্যাদি।

মাছআলা: (৭৬)

যদি কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ গোসল করে তাহলে গোসলের সাথে সাথে অজু হয়ে যাবে। নামাজের জন্য নতুনভাবে অজুর প্রয়োজন নাই। তবে সেক্ষেত্রে

গোসলের সুন্নাত তরিকা হচ্ছে; গোসলের পূর্বে যেন অজু করে নেয়। আর গোসলের পর নতুন (তাজা) অজু ইবাদতের নিয়্যতে করা অতিব উত্তম।[৩৭]

মাছআলাঃ (৭৭)

অজু ভঙ্গকারী বস্তু ২০টি, তন্মধ্যে সামনে-পিছনের স্থান হতে ১০টি আর সমস্ত শরীর হতে ১০টি। সামনে-পিছনের স্থান হতে ১০টি হচ্ছে– (১) প্রস্রাব করা (২) মজী নির্গত হওয়া (৩) ওয়াদী নির্গত হওয়া অর্থাৎ সে পূজজাতীয় পানি যা প্রস্রাবের পরে নির্গত হয় (৪) বাতাস বের হওয়া (মহিলাদের ক্ষেত্রে) (৫) পাথর বের হওয়া (৬) ইস্তেহাজা ইত্যাদির রক্ত প্রবাহিত হওয়া। এই ৬টি সামনের স্থান হতে। আর ৪টি হচ্ছে পিছনের রাস্তা হতে- (১) বায়ু বের হওয়া (২) পায়খানা বের হওয়া (৩) কীট বের হওয়া (৪) বহুমূত্রার রক্ত বের হওয়া।

আর সমস্ত শরীর হতে ১০টি। যেমন- (১) রক্ত বের হওয়া (২) পূজ বের হওয়া (৩) হলুদ রংয়ের পানি বের হওয়া (৪) মুখ ভরে বমি করা (৫) নেশাগ্রস্থ হওয়া (৬) পাগল হওয়া (৭) হেলান দিয়ে শয়ন করা (৮) নামাজের মধ্যে উচ্চস্বরে হাসা (৯) কোন অসুস্থতার কারণে বেহুশ হওয়া (১০) মহিলা ও পুরুষ উভয়ই নগ্ন হয়ে শাহ্ওয়াতের সাথে একে অপরকে হাত লাগানো।

মাছআলাঃ (৭৮)

পানি যদি ঘোলাটে হয়, উক্ত পানি দ্বারা গোসল ও অজু করা বৈধ। যতক্ষণ পর্যন্ত গন্ধ এবং স্বাদ পরিবর্তন না হবে।

মাছআলাঃ (৭৯)

রং, খোশবু এবং স্বাদ অপবিত্র বস্তু পড়ার কারণে যদি উক্ত গুণ সমূহের পরিবর্তন ঘটে সেক্ষেত্রে উক্ত পানি দ্বারা অজু ও গোসল করা বৈধ নয়। যদি

[৩৭]. ফতোয়ায়ে বরকাতুল উলুম, পৃষ্ঠা-৬৪

পবিত্র বস্তু পতিত হওয়ার কারণে যেমন- সাবান, জাফরান ইত্যাদি কারণে কিংবা পানি অনেকদিন বন্ধ থাকার কারণে রং, খোশবু ও স্বাদ পরিবর্তন হলে উক্ত পানি অপবিত্র নয়। উক্ত পানি দ্বারা গোসল এবং অজু করা বৈধ। তবে পানি পাওয়া যেতে হবে। অর্থাৎ পানি যেন গাঢ় না হয়ে পাতলা হয়।

প্রবাহিত তথা প্রবাহমান পানির হুকুম হচ্ছে- পানি এই পরিমান হতে হবে যে- যদি কেউ এতে পাতা ফেলে দেয় তা প্রবাহমান হবে। তবে সে পানির উৎপত্তি স্থল তথা শুরু পবিত্র হবে অর্থাৎ যেখান থেকে পানি প্রবাহিত হয়েছে, তা পবিত্র হতে হবে। যদিওবা অপবিত্র বস্তু ভাসমান হবে তবু উক্ত পানি পাক। সে পানি দ্বারা অজু ও গোসল করা বৈধ।

মাছআলা: (৮০)

ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহে আলাই এর মতে- অজুর মধ্যে ফরজ হচ্ছে ৪টি। যা পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত।

(১) সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা (২) কনুসহ উভয় হাত ধৌত করা (৩) মাথার চার ভাগের এক ভাগ (এক চতুর্থাংশ) মাসেহ করা (৪) গিড়ালীসহ উভয় পা ধৌত করা।

ইমাম মালেক (রহ:) এর মতে অজুর মধ্যে ফরজ ৭টি। যথা: (১) নিয়ত করা (২) মুখমন্ডল ধৌত করা (৩) হাত ধৌত করা (৪) সমস্ত মাথা মাসেহ করা (৫) উভয় পা গিড়ালী পর্যন্ত ধৌত করা (৬) অজুর কর্ম তথা অজুর অঙ্গ সমূহে ধৌত করার ক্ষেত্রে পর পর দ্রুততার সাথে করা (৭) অজুর অঙ্গ সমূহে পানি ভাল ভাবে পৌঁছানো। ইমাম শাফেয়ী (রহ:) এর মতে অজুর ফরজ ৬টি। যথা: (১) নিয়ত করা (২) সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা (৩) কনুসহ উভয় হাত ধৌত করা (৪) মাথার কিছু অংশ মাসেহ করা এমনকি কয়েকটি চুলের উপর মাসেহ করলেও হবে (৫) গিড়ালী সহ উভয় পা ধৌত করা (৬) অজুর অঙ্গ সমূহ তারতীব হিসেবে ধৌত করা।

ইমাম আহমদ (রহ:) এর মতে অজুর ফরজ ৬টি। যথা: (১) মুখমন্ডল ধৌত করা (২) কনুসহ উভয় হাত ধৌত করা (৩) সমস্ত মাথা কান পর্যন্ত

মাসেহ করা (৪) গিড়ালী পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করা (৫) তারতীব হিসেবে ধৌত করা (৬) পর পর অজুর অঙ্গ সমূহ বিরতিহীন ভাবে ধৌত করা।[৩৮]

মাছআলাঃ (৮১)

অজুর অঙ্গ সমূহ ধৌত করার মধ্যে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া এ জন্যই মুকাদ্দস (প্রথমে) করা হয়েছে যে পানির তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একটি হচ্ছে রং যা দেখার দ্বারা অবগত হওয়া যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্বাদ বা মজা যা মুখে গ্রহণ করার মাধ্যমে জানা যায়। আর তৃতীয়টি হচ্ছে ঘ্রাণ যা নাকে দেওয়ার মাধ্যমে বুঝা যায়।

মাছআলাঃ (৮২)

অজুর মধ্যে নাকে পানি দেওয়ার পূর্বে কুলি করার কথা এ জন্যই বলা হয়েছে যে, মুখ নাক হতে আফজল ও ফজিলত। আর এতে দেখার দৃষ্টি শক্তি অনেকাংশে বেশী। যেমন এটি তেলাওয়াতে কোরআন শাহাদাতাইন পাঠ ও খানা-পানি প্রবেশ করানোর স্থান।

মাছআলাঃ (৮৩)

কোন নামাজী ব্যক্তির অযূ নষ্ট হয়েছে এবং অযূ করার জন্য বাইরে আসল। তখন সে যেন নামাযেই রয়েছে। যদি তার থেকে নামায নষ্টকারী কোন কাজ পাওয়া না যায় যেমন হাসা, কথা বলা ইত্যাদি।

মসজিদের বর্ণনা

মাছআলাঃ (৮৪)

মসজিদের অভ্যন্তরে গাছ লাগানো মাকরূহ। কতেক ফকীহ ইহাকে নাছারাদের সাদৃশ্য বলে মত পোষণ করেছে। **لانـه تشبيه بالبيت** হ্যাঁ যদি এর দ্বারা মসজিদের কোন উপকার হয় তাতে কোন অসুবিধা নাই।

[৩৮]. শরহে মুসলিম ১ম খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা

ويكره غرس الشجر فى المسجد الا ان يكون له منفعة للمسجد[৩৯]

হাদিস শরীফে মসজিদের সৌন্দর্যের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- মসজিদ সমূহকে সৌন্দর্যমন্ডিত ও শোভা বর্ধনের জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

ফতোয়ায়ে শামী গ্রন্থে উল্লেখ আছে- মসজিদের দেয়ালে কোরআন শরীফের আয়াত লেখা মাকরূহ বলেছে। এ জন্য যে কোন সময় মসজিদের দেয়াল শহীদ (ভেঙ্গে) হয়ে গেলে আয়াতে কোরআনের অসম্মানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এজন্যই মাকরূহ। উল্লেখিত হাদিস শরীফের আলোকে সমস্ত ইমামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছে যে- মসজিদে নক্শা তথা কারুকার্য করা মাকরূহ।

ফতোয়ায়ে আলমগীরি গ্রন্থে বর্ণিত আছে–

والاولى ان تكون حيطان المسجد الابيض غير منقوشة ولا مكتوب عليه

উত্তম হচ্ছে যে- মসজিদের দেয়াল সাদা রাখা এবং সমস্ত কারুকার্য ও নক্শা ও কোন কিছু লেখা হতে মুক্ত রাখা। কেননা হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে কারুকার্য করা নিষেধ করেছেন।

ফতোয়ায়ে আলমগীরি গ্রন্থে এটিও বর্ণিত আছে যে-

ولا يكره نقش المسجد بالجص ومأه الذهاب

অর্থাৎ: স্বর্ণ ইত্যাদি দ্বারা যদি মসজিদে বিভিন্ন প্রকার কারুকার্য কিংবা ফুলদানি বানানো কিংবা স্বর্ণের পানি লেপন করা হয় তা মাকরূহ নয়, ফোক্হায়ে কেরামগণ এর অনুমতি প্রদান করেছেন। কেননা, এটি দেয়াল পাকা-পোক্ত ও মজবুতের খেয়ালে করা হয়। শোভা বর্ধনের উদ্দেশ্যে নয়। আর আয়াতে কোরআন ইত্যাদি পাঠ করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে। এ জন্য তা মাকরূহ।

---

৩৯. (فتوى هنديه ج/১ صفه ৫৭)

মাছআলাঃ (৮৫)

ইমাম ওয়াহেদ বলেন– **إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ الخ** আয়াত দ্বারা প্রতিয়মান হয়েছে যে- কাফেরগণ মুসলমানদের মসজিদ তৈরী করে না এবং মসজিদের জন্য চাঁদাও প্রদান করে না। বরং এ রকম হতে পারে যে- কোন মুসলমান কাফেরগণ হতে মসজিদ তৈরীর জন্য ঋণ ও কর্জ নিয়ে এবং তা মসজিদের জন্য খরচ ও ব্যয় করে ছিল অতঃপর কাফের উক্ত ঋণ মাফ ও ক্ষমা করে দিল, তা জায়েজ হবে।

মাছআলাঃ (৮৬)

যদি কোন কাফের মৃত্যু মুহূর্তে ওসিয়ত করে যে- আমার সম্পদ হতে মসজিদ তৈরী করিও, এ ক্ষেত্রে তার ওসিয়ত পূরণ যোগ্য নয়। এর উপর হানাফীগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[৪০]

মাছআলাঃ (৮৭)

সর্বদা মসজিদের আজমতে শান তথা বুজুর্গী ও শান-শওকতের দিকে খেয়াল রাখা আবশ্যক। মসজিদে কাফের এবং অপরাপর ইসলামের দুশমনদের প্রবেশ করতে না দেওয়াই উত্তম।

মাছআলাঃ (৮৮)

বিশ্বের সকল মসজিদ মাজাজী তথা রূপক, না হয় প্রকৃত মসজিদ হচ্ছে আউলিয়ায়ে কেরামদের ক্বলব ও অন্তর। যা সকল প্রকার শিরক হতে পাক-পবিত্র।

مسجدے کان دروون اولیاط است ☆ خانہ خاص حقیقت انجا خداست
نیست مسجد جز درون سروران ☆ آں مجازست ایں حقیقت ای جوان

[৪০]. তাফসীরে ফয়ুজুর রহমান, পারা-১০, পৃষ্ঠা-১৭৭

আর সেটিই হচ্ছে প্রকৃত মসজিদ, যা আউলিয়ায়ে কেরামদের অন্তরে বিদ্যমান, এ জন্যই সেটি আল্লাহর প্রকৃত ও খাছ ঘর। আল্লাহর অলীদের ক্বলব (অন্তর) ব্যতীত আর কোন মসজিদ নাই। বিশ্বে বিদ্যমান মসজিদ সমূহ হচ্ছে মাজাজী (রূপক)। পক্ষান্তরে হাকীকি মসজিদ সেটি যা আউলিয়াদের ক্বলবে রয়েছে।[৪১]

মাছআলা: (৮৯)

মসজিদে পা মোচার জন্য পাপোশ রাখা মাকরূহ। মুহীত গ্রন্থে আছে–

ما يفعل في زماننا من وضع البواري فى المسجد ومسح الاقدام عليها فهو مكروه عند الائمة اجمع -

আমাদের বর্তমান সময়ে যে রেওয়াজ হয়ে গেছে যে মসজিদে পাপোশ রাখা হয় পা মোচার জন্য তা মাকরুহ।

মাছআলা: (৯০)

আহলে মসজিদ তথা মসজিদে ইবাদতকারীদের জন্য মসজিদের দরজা বন্ধ করে রাখা মাকরূহ।

ويكره لاهل المسجد ان يغلقوا باب المسجد

আমাদের হানাফী ইমামগণ বলেন– এটি পূর্ববতী তথা তখনকার সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু আমাদের বর্তমান সময়ে নামাজের সময় ব্যতীত মসজিদের দরজা বন্ধ রাখা দোষণীয় নয়।

وهذا فى زمانهم امّا فى زماننا فلا بأس باغلاق ابواب المساجد فى غير اذان الصلواة لانه يؤمن من على مناع المسجد وبنائه ويصره من قبل السارق لانّه الغلبة فى زماننا لاهل الفسق, والحكم يختلف باختلاف احوال الناس الاترى ان النساء كن يحضرن الجماعة فى

[৪১]. তাফসীরে ফুয়ুজুর রহমান, পারা-১০, পৃষ্ঠা- ১১৬

عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم منعن ذلك لفساد احوال الناس وهو الصواب فى مرأتنا۔

অর্থাৎ মসজিদ সমূহের দরজা নামাজের জামাতের সময় ব্যতীত বন্ধ রাখা মাকরূহ নয়। কেননা মসজিদের মাল তথা আসবাবপত্র, জায়নামাজ ইত্যাদি চুরি হওয়ার খুবই আশংকা। নামাজী সেজে এই গুলো চুরি করাটা অসম্ভব কিছু নয়। কেননা লোকগণের অন্তর হতে মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি ভক্তি মুহাব্বত ও মহান প্রভূর ভয় ভীতি হ্রাস পাচ্ছে, এবং মানুষ পাপাচার ও অন্যায়াচারণে অধীকভাবে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। শরীয়তের বিধি নিষেধ লোকদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত পাল্টে যাচ্ছে। যেমন হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে মহিলাগণ মসজিদে আসার অনুমতি ছিল, পরবর্তীতে তা নিষেধ করা হয়েছে। লোকদের মধ্যে ফিতনা ফ্যাসাদের কারণে এ ধরনের অনেক মাছআলা রয়েছে যার হুকুম এভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যেমন তারাহবীর খতমে কোরআনের সময় কিংবা স্বতন্ত্র খতমে কোরআন শরীফ, খতমে বুখারী শরীফ ও অপরাপর বিভিন্ন খতমসমূহের সময় সংবদ্ধ তথা ইজতেমায়ী অবস্থায় দোয়া প্রার্থনার ব্যবস্থা করা তাতে অসুবিধার কিছু নাই। বরং লোকদের অন্তরে সামান্য পরিমাণ আল্লাহর ভয় ভীতি সৃষ্টি হবে। কাজেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি জায়েজ রাখা হয়েছে। কেননা হয়তবা আল্লাহ তা'য়ালার দয়ায় মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং ধর্মীয় কর্মকান্ডের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে। কেননা বর্তমান মানুষের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে দুনিয়ার কাজ কর্ম ও দুনিয়ার প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেড়ে গেছে এবং অলসতা ও গাফলতি অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে, কাজেই মাহফিলের ব্যবস্থার মাধ্যমে লোক জমায়েত করে দোয়া করা এবং খতম তারাহবীর পরে দোয়া করা, জানাযার নামাজের পর দোয়া করা, মৃতকে নিয়ে যাওয়ার সময় যিকিরে এলাহী করা এবং দোয়ার মাহফিলের ব্যবস্থা করা, যিকিরের মাহফিল করা, তাকবীর বলা ইত্যাদি ইত্যাদি জায়েজ। বরং মুস্তাহাসন, যেমন পবিত্র হাদীস শরীফে আছে –

من راه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن

অর্থাৎ মুসলমানগণ যা ভাল ও নেক কাজ মনে করে তা আল্লাহ তা'য়ালার নিকটও ভাল ও উত্তম। বর্তমান ফিতনা ফ্যাসাদ ও অলসতা এবং দুনিয়ার প্রতি মানুষ খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। আল্লাহ পাক মানুষদেরকে ভাল কাজ করার তৌফিক দান করুন।

মাছআলাঃ (৯১)

মসজিদের ছাদ মসজিদের হুকুমভূক্ত।

سطع المسجد حكم المسجد

ঈদের নামাযের বর্ণনা

মাছআলাঃ (৯২)

যদি কোন হানাফী মতাবলম্বী ব্যক্তি শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামের পিছনে ঈদের নামাজ আদায় করে আর ইমাম শাফেয়ী মাযহাব হিসেবে প্রথম রাকাতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে পাঁচ তাকবীর অতিরিক্ত বলে তবে হানাফী মতালম্বী মোক্তাদি তার (শাফেয়ী ইমামের) অনুসরণ করা আবশ্যক এই জন্যই যে পবিত্র হাদিস দ্বারা এটির প্রমাণ রয়েছে। দুররে মোখতার দ্বিতীয় খন্ডের ৭৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

ولـوزاد رابــعة إلى ستة عشر لانه ماثـور

মাছআলাঃ (৯৩)

ঈদের নামাজ আদায়ের পদ্ধতি নিম্নে দেয়া হলঃ

প্রথমে ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ে ঈদের নামাজের নিয়ত করবে যে- আমি কেবলামুখী হয়ে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আজহার দু'রাকাত ওয়াজিব নামাজ ছয় তাকবীর সহকারে আদায় করতেছি। নিয়ত করার পর ইমাম উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর বলে হাত বাঁধবে এবং মুক্তাদি নিম্ন স্বরে তাকবীর বলে হাত বাঁধবে, অতঃপর ইমাম মুক্তাদী উভয়ই ছানা পাঠ করবে। এরপর

ইমাম উচ্চস্বরে তাকবীর বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত নিয়ে ছেড়ে দিবে, হাত বাঁধবে না এবং সমস্ত মুক্তাদীও অনুরূপ করবে, অতঃপর দ্বিতীয় বার ইমাম তাকবীর বলে পূর্বের ন্যায় হাত ছেড়ে দিবে, মুক্তাদীগণও অনুরূপ করবে, এরপর তৃতীয় বার ইমাম তাকবীর বলে হাত বাঁধবে সাথে সাথে মুক্তাদীগণও হাত বাঁধবে। তারপর ইমাম সাহেব নিম্ন স্বরে তা'উয ও তাসমীয়া (আ'উযু বিল্লাহ ও বিছমিল্লাহ) পাঠ করে উচ্চ স্বরে সূরায়ে ফাতেহা ও কেরাত পাঠ করে রুকু সিজদা করে দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দন্ডয়মান হয়ে সূরায়ে ফাতেহা ও কেরাত পাঠ করে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তাকবীর বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত নিয়ে ছেড়ে দিবে। মুক্তাদীগণও অনুরূপ করবে, তেমনিভাবে দ্বিতীয় তাকবীর বলে ইমাম মুক্তাদী উভয়ই হাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর তৃতীয়বার তাকবীর বলে হাত উঠাবে এবং ছেড়ে দিবে এরপর চতুর্থ তাকবীর বলে রুকুতে চলে যাবে। উক্ত নিয়মে ঈদের দু'রাকাত নামাজ পরিপূর্ণ করবে।

নামাজ শেষে ইমাম দোয়া করে মিম্বরে উঠে দন্ডায়মান হয়ে খুতবা পাঠ করবে, মুক্তাদিগণ নিরবে শ্রবণ করবে। জুমার খুতবার ন্যায় ঈদের নামাজেও খুতবা দু'টি, আর যদি খুতবার পরে ইমাম দোয়া করে তাতেও অসুবিধার কিছু নাই।[৪২]

মাছআলাঃ (৯৪)

ঈদের নামায, জুমাতে লোকের আধিক্যের কারণে সিজদা সাহু করাতে কেউ খবর রাখবে আর কেউ রাখবে না তাই সেখানে সিজদা সাহু আদায় করবে না।

খোতবার বর্ণনা

মাছআলাঃ (৯৫)

[৪২]. ইসলাম ফিকহ, ২য় খন্ড, ৩০৪পৃষ্ঠা

আজকাল সময়ে (বর্তমানে) জুমার খোতবায় বাদশাহগণের নাম নেওয়া হয়। তাদেরকে **عادل** তথা ন্যায়বিচারক বলা হয়ে থাকে এবং তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার প্রথা খতিবদের মধে পরিলক্ষিত হয়- যা হারাম। কেননা, বাদশাহ্ জালেম আর জালেমকে আদেল তথা ন্যায় বিচারক বলা কুফরী। আর তাদের প্রশংসা করা মিথ্যা-বানোয়াটি এবং তোশামোদ। কোন কোন ইমাম বলেন- তোমরা এ সমস্ত খতিবদের থেকে দুরে বস যেন তাদের মিথ্যা এবং এ সমস্ত জালেম ও ফাসেকের প্রশংসা শুনতে না হয়।[৪৩]

মাছআলাঃ (৯৬)

যখন খুতবা প্রদানের জন্য ইমাম সাহেব মিম্বরে বসেন তখন মুয়াজ্জিন ইমামের বরাবর সামনে কিছুটা দুরে আজান দিতে হবে। তবে প্রথম আজানের আওয়াজ (কণ্ঠস্বর) হতে দ্বিতীয় আজানের আওয়াজ নিম্নস্বরে হতে হবে। অনেক ফকীহগণ দ্বিতীয় আজানের জওয়াব দেওয়াটা মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রহ.)-এর একটি ঘটনা ছহীহ বুখারী শরীফ ১ম খন্ডের ১২০ পৃষ্ঠায় নকল করা হয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী ফকীহগণ এটি অর্থাৎ আজানের জওয়াব দেওয়া জায়েয বলেছেন।

হযরত আবদুল হাই লক্ষ্মৌবী প্রণীত 'উমদাতুর রে-আয়া' নামক কিতাবে এটিকে ছহীহ শুদ্ধ বলে মতপোষণ করেছেন।

فلا تكره اجابة الاذان الذى يؤذن بين يدى الخطب وقد ثبت ذالك من فعل معاوية فى صحيح البخارى

অর্থাৎ: খতিবের সামনে অবস্থানকারীগণ আজানের জওয়াব দেওয়া মাকরূহ নয়। যা হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.) হতে প্রমাণিত।[৪৪]

[৪৩] . মেরকাত, মেরআত।

[৪৪]. উম্দাতুর রেআয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪৪।

হ্যাঁ, তবে **انصاف** তথা সুবিচার ও পক্ষপাতহীন হচ্ছে শ্রোতাগণ অন্তরে গোপনে গোপনে জওয়াব দিবে।

মাছআলাঃ (৯৭)

নামাজের পূর্বে জুমার খুতবা প্রদান ওয়াজিব। আর দু'ঈদের খুতবা নামাজের পরে দেওয়া সুন্নাত। এই খুতবা না পড়া খারাপ এবং সুন্নাত পরিহারকারী। জুমার ক্ষেত্রে খুতবা পরিহারকারী গুনাহগার হবে। জুমার নামাজে অতিরিক্ত কোন তাকবীর নাই; পক্ষান্তরে দু' ঈদের নামাজের মধ্যে প্রতি রাকাতে তিনটি করে অতিরিক্ত তাকবীর বলা হয়ে থাকে।

মাছআলাঃ (৯৮)

জুমার খুতবার ন্যায় দু'ঈদের মধ্যেও দুটি খুতবা রয়েছে আর এই দুই খুতবার মধ্যবর্তী বসা সুন্নাত।

জুমার বর্ণনা

মাছআলাঃ (৯৯)

যখন জুমার নামাজের দ্বিতীয় আজানের পর ইমাম সাহেব খুতবা প্রদানের জন্য দন্ডয়মান হবেন তখন হতে জুমার নামাজ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত নফল নামাজ তাছবীহ-তাহলীল, জিকির-আছকার সহ সব ধরনের কথা-বার্তা বলা নিষেধ। হ্যাঁ তবে তারতীব হিসাবে ক্বাজা নামাজ আদায়কারী ক্বাজা পড়ে নিবে এবং কোন ব্যক্তি খুতবা প্রদানের পূর্ব মুহূর্তে সুন্নাত কিংবা নফল নামাজ আরম্ভ করে থাকলে তা তাড়াতাড়ি শেষ করে খুতবা শ্রবণ করবে।

মাছআলাঃ (১০০)

জুমার দিবসে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত হতে দরূদ শরীফ পাঠ অধিক উত্তম।

وسن اكثار الصلواة على النبى عليه السلام يومها وليلتها للاخبار الصحيه فى الامر بذالك فالاكثار من الصلواة على النبى عليه السلام

افضل من اكثار ذكر او القرآن لم يرد بحضوصه – (رساله التريـاق النـافع، للعلامة السيد ابى بكربن عبد الله دهلوى)

মাছআলা: (১০১)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যেমনিভাবে ফরজে ক্বত্য়ী, ঠিক তেমনিভাবে জুমার নামাজও। কাজেই জুমার নামাজের ক্ষেত্রেও অলসতা ও অবহেলা না করা চাই। কোন বেনামাজী যদি জুমার নামাজ আদায় করে তা ছহিহ ও শুদ্ধ হবে তবে কবুল ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকতে পারে। সে আল্লাহর পবিত্র দরবারে অবশ্যই আশা পোষণ করতে হবে যে, তিনি (আল্লাহ্) তাঁর ফজল ও করম (দয়া-মেহেরবানী) দ্বারা আমাদের নেক ও ভাল কর্ম সমূহকে কবুল করবেন। আল্লাহপাক ক্ষমাশীল ও কৃতজ্ঞ অর্থাৎ তিনি গফুর ও শকুর এই গুণাবলী তার পবিত্র সত্ত্বার বেলায় ভাল ধারণা রাখার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন।[৪৫]

মাছআলা: (১০২)

তোহফায়ে বুর্‌রার মধ্যে রয়েছে যে, কোন কোন বর্ণনায় জুমার নামাজের পূর্বে কবর জেয়ারত করা নিষেধ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, মূলত: ইহা একটি ভিত্তিহীন কথা যা হারামাইনের পরিপন্থী একটি কাজ। এ ধরনের বর্ণনা দ্বারা আহলে হারামাইনের বর্ণনাকে রহিত করার অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ জুমার নামাজের পূর্বে কবর জেয়ারত হারামাইনদের কর্ম যা জায়েজ ও বৈধ।[৪৬]

[৪৫]. বরকাতুল উলুম, পৃষ্ঠা-৬৪

[৪৬]. ফতোয়ায়ে মাজ্‌মায়ুল বারকাত, তাফসীরে সূরায়ে আলাম নাশরাহ, কৃত-আল- ামা নক্বী আলী খান সাহেব পৃষ্ঠা-২১৪

ইমামতের বর্ণনা

মাছআলাঃ (১০৩)

فاسق معلن তথা স্বগোষিত ফাসেককে (যার ফাসেক হওয়াটা সর্ব সাধারণের জ্ঞাত) ইমাম নিযুক্ত করা গুনাহ। তার পিছনে নামাজ আদায় করা মাকরূহে তাহরীমি, আদায় করা গুনাহ এবং পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

শরহে মুনীয়াতুল মুস্তামলীতে বর্ণিত রয়েছে–

انّهم لو قدموا فاسقا ياثمون بناء على انّ كراهة تقديمة كراهة تحريمة لعدم اعتنائيه باموردينه, تبيين- طحطاوى على مراقى, فتاوى الحجة فتاوى رضويه-

হ্যাঁ যদি জুমার মধ্যে অন্য ইমাম পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে জুমার নামাজ আদায় করবে, কেননা ইহা ফরজ আর ফরজ গুরুত্ববহ। অনুরূপ যদি তার পিছনে নামাজ না পড়লে ফিতনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে পড়ে নিবে, পরবর্তীতে পুনরায় আদায় করে নিবে। কেননা **الفتنة اشد من القتل**

ঈমান–আক্বীদার বর্ণনা

মাছআলাঃ (১০৪)

আমরা সকলে আহলে তাওহীদ মু'মিন মুসলমান অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই মু'মিন। তিনটি বস্তুর সমষ্টির নাম ঈমান। ১. জিহ্বা দিয়ে স্বীকৃতি প্রদান। ২. অন্তর দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন। ৩. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আমল। অর্থাৎ, মুখে কালেমা স্বীকার করা, অন্তর দিয়ে তা সত্য জানা ও আদেশ নিষেধ পালন করা। এ তিন কাজকে ঈমানের রুকন বলা হয়।

মাছআলাঃ (১০৫)

ঈমানের শর্ত সাতটিঃ

১. নিজ ইচ্ছায় ঈমান আনা ২. ইলমে গায়েব যা তাকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। ৩. বেহেশত ও দোযখ সত্য মানা ৪. আল্লাহ যে সকল বস্তুকে হালাল বলেছেন, তাকে হালাল বুঝা ৫. আল্লাহ পাক যে বস্তুকে হারাম বলেছেন তাকে হারাম বুঝা ৬. আল্লাহর রাগ ও আযাবকে ভয় করা ৭. আল্লাহর রহমতের আশা রাখা।

মাছআলাঃ (১০৬)

বিধান সাত প্রকারঃ

১. ঈমানদারকে হত্যা না করা ২. মু'মিনকে অন্যায়ভাবে যুলুম না করা ৩. মু'মিনের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা ৪. মু'মিনকে অন্যায়ভাবে কষ্ট না দেওয়া ৫. কোন মু'মিনের উপর খারাপ ধারণা না করা। ৬. এ পাঁচটি দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক। আর দু'টি পরকালের সাথে সম্পর্ক।

মাছআলাঃ (১০৭)

১. কিছু লোকেরা আদমকে ফেরেশেতারা সিজদা করা দ্বারা একজন মানুষ অপর মানুষেকে সিজদা করার বৈধতা দিয়ে থাকে। তাদেরকে বলি আদম (আঃ)কে ফেরেশতারা সিজদা করেছে তা ঠিক, তবে তা কখন ও কোথায় তাও বলা জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

আমি যখন তাকে তৈরী করেছি এবং তার মাঝে রূহদান করেছি তখন তারা সিজদায় পড়ে গেলেন।[৪৭]

এখানো আদম (আ:) সৃষ্টি হয়নি আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, যখন আদম (আ:) সৃষ্টি হবে এবং তার মাঝে রূহ আসে তখন আমার আদেশ হল তোমরা তাকে সিজদা করবে। আদেশটি দিয়েছেন আদম সৃষ্টির পূর্বে এবং এই সিজদা আদমের সম্মানের জন্য। তার উপর কিয়াস করা যাবে না; কেননা ফেরেশতারা আমাদের দলের নন। যেমন সাহাবায়ে কেরামরা রাসূলকে সিজদা করার অনুমতি তালাশ করেছিলেন তখন তাদের আবেদন পূর্ণ হয়নি। সেখানেও একই কথা।

২. দ্বিতীয়তঃ

তখন আদম (আ:) নবী হননি শরীয়তের ভেতরে ছিলেন না। তাই তার উপর কিয়াস করা যাবে না বা তার উপর বিধানের ভিত্তি স্থাপন করা যাবে না।

৩. তৃতীয়তঃ তা যমীনের সীমারেখাতে ছিল না কেননা; জগত কয়েকটি রয়েছে যেমন মেছালী জগত, রূহ জগত, কবর জগত, পরকাল জগত। আখরাতে তাযীমের যে সিজদা ফেরেশতারা করেছে তার সাথে শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই, তার উপর মাসায়েল কিয়াস করা যাবে না ও সমাধান বের করা যাবে না। হযরত আদম (আ:) যিনি হাকায়েকে লাহুতিয়া, মালাকুতিয়া, মাসুতিয়া এবং আল্লাহর একটি নিদর্শন ও ফেরেশতাদের সিজদার স্থান তার প্রশংসা কিভাবে করা যায়। আহলে সুন্নাতের সকল মাশায়েখ কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বালীর নিকট গাইরুল্লাহর জন্য সিজদা করা হারাম। তারা এ ব্যাপারে তাদের অনুসারীদের সতর্ক করেন। এ ব্যাপারে অসংখ্য রেফারেন্স আলা হযরত আহমদ রেযা খান বর্ণনা করেছেন।

[৪৭]. হিজর:২৯।

তবে অজ্ঞ পীর সূফী ও হটকারী গবেষক হয়ে তার পক্ষে দলীল পেশ করে ফেরেশতাদের সিজদা দিয়ে। তাদের দুনিয়া তো ভিন্ন তাদের শরীয়ত ভিন্ন। তাই এ থেকে বুঝা গেল আদম (আ:) কে সিজদা দেওয়া হয়েছে ঊর্ধ্ব জগতে আর আমরা থাকি নিম্ন জগতে তাই সূফীদের নিয়মনীতি হল, ঊর্ধ্ব জগতের নিয়মনীতি নিম্ন জগতে ব্যবহার করা যাবে না।

বুদ্ধিমানরা একটু চিন্তা করুন! জমহুর আলিমগণ যে মাছআলায় একমত একজন সাধারণ মানুষ যেমন শরয়ী উসূলের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেনা তার লিখার কি মান? আল্লাহ সকলকে বুঝ দান করুন! হযরত সূফিয়ায়ে কেরাম ও সলফে সালেহীনের নিয়মনীতি বিধান ও সমাধান সত্য। কিন্তু অজ্ঞ সূফী ও পীর তাদেরকে ভূল পথে পরিচালিত করেন। তাই আমি বলি, মাথা ও কপাল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট যদি শরীরের সকল অঙ্গ অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন কোন অঙ্গ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হবে। যদি অন্যদের জন্য কপাল ব্যবহার করা হয় তখন তো তা ব্যপক হয়ে গেল।

মাছআলা: (১০৮)

আল্লাহ জাল্লা শানুহু এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান গ্রহণ করা একটি অপরটির সাথে সম্পৃক্ত তথা এক ও অভিন্ন, এর মধ্যে একটি অপরটি ব্যতীত জিকির ও তছবীহ হতে পারে না। যেমন- কালেমায়ে শাহাদাত, আজান-ইকামত সহ অপরাপর তাছবীহ- তাহলীলে রয়েছে।

মাছআলা: (১০৯)

নিজ আক্বীদা ও মছলকের খেলাফ তথা পরিপন্থীদের পিছনে নামাজ আদায় করা মাকরূহ।

كراهة الصلوة خلق المخالف حيث امكنه خلف غيرهم ومع ذالك الصلوة معهم افضل من الانفراد وتحصل له فضيلة الجماعة, وذكر الفاسق والمبتدع قال لان الصلوة خلف هؤلاء مكروهة مطلقًا. (الاشباه والنظائرمع شرح الحموى جلد-8, صفحه ৩৭৮-৩৭৯)

মাছআলাঃ (১১০)

শরীয়তের হুকুম আটটিঃ (১) ফরজ (২) ওয়াজিব (৩) সুন্নাত (৪) মুস্তাহাব (৫) হালাল (৬) মোবাহ (৭) মাকরূহ (৮) হারাম।

মাছআলাঃ (১১১)

ফরজ তিন ভাগে বিভক্তঃ

(১) ফরজ যাহা কোরআন শরীফ দ্বারা সাবেত। যেমন– **اقيمو الصلوة واتوالزكوة** অর্থাৎ নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।

(২) ফরয, যাহা- **حديث متواتر** তথা ঐক্যমতের ভিত্তিতে সাবেত ও প্রমাণিত। যেমন- হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফের পর সকল সাহাবায়ে কেরামদের সন্দেহ হয়েছে যে- আল্লাহপাক জাল্লা শানুহু কোরআন শরীফে এরশাদ করেছেন ১৪টি স্থান, যাতে সিজদা করার জন্য। এ সমস্ত আয়াত দ্বারা একটি সিজদা করার হুকুম প্রমাণিত হয়েছে। নামাজে কিয়াম একটি রুকু একটি আর সিজদা দু'টি। কেননা তখনকার সময় সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের মধ্যে কখনো এক সিজদা করেননি আর যদি দু'টি সিজদা ফরজ না হত তাহলে কখনো কখনো একটি সিজদার উপরই নামাজ আদায় করতেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে- দ্বিতীয় সিজদাও করতে হবে এবং এটিই ফরজ হওয়ার দলিল। তবে এই দলিলই সমস্ত মুসলমানের জন্য যথেষ্ট। প্রথম সিজদাটি হচ্ছে কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আর দ্বিতীয় সিজদা **اجماع امت** (ঐক্যমত) দ্বারা প্রমাণিত।

(৩) ফরজ, যাহা ফরয হওয়াই **حديث متواتر** অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ সম্পর্কে বারংবার এরশাদ করেছেন সে কাজও ফরজ। এই তিন প্রকারের ফরজের মধ্যে কোন একটিকে অস্বীকার করা কাফের।

মাছআলাঃ (১১২)

শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফের হবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদাও অনুরূপ। শরীয়তের কোন ওজর বা আপত্তি (অজুহাত) ব্যতীত নামাজ তরক করা (ছেড়ে দেওয়া) কবীরা গোনাহ। কিন্তু তদাপিও এই কবীরা গোনাহর কারণে কোন ব্যক্তি কাফির হবে না। আর উক্ত হাদীস যাতে রয়েছে যে, নামাজ পরিহারকারী কাফির। শরীয়তের দলিলের ভিত্তিতে এর সারকথা হচ্ছে; যে ব্যক্তি ফরয নামাজকে অস্বীকার করে কিংবা নামাজ তরক করাকে জায়েয মনে করে এবং নামাজ পরিহার করাকে গোনাহ মনে না করে। যেমন বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা এই যে, বেনামাজী মুসলমানও নামাজকে ফরজ হিসাবে জানে এবং পরিহার করাকে গোনাহ বলে জ্ঞান রাখে তারপরও মানবীয় অভ্যাস হিসাবে নামাজ আদায় করে না, সে সমস্ত ব্যক্তি কাফের হবে না। তবে বড় গোনাহগার হবে।[৪৮]

মাছআলাঃ (১১৩)

নবী আলাইহিস্সালাম হাজের-নাজের ও সর্বত্র বিরাজমান, অর্থাৎ নবুওয়াত ও রেছালাতের পদ মর্যাদা হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় ও সর্বস্থানে বিরাজমান। পবিত্র কোরআনে এরশাদ করা হয়েছে– **وعلموا ان فيكم رسول الله** তবে বশরীয়াতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্দা ও বেছাল ফরমায়েছেন। **انك ميت وانّهم ميتون**

মাছআলাঃ (১১৪)

আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুকে ভয় না করা ও অভয় হওয়া কুফুরী।

[৪৮]. বরকাতুল উলুম

মাছআলাঃ (১১৫)

আল্লাহপাক সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উপর ভরসা না করা কিংবা নৈরাশ হওয়া কুফুরী।

মাছআলাঃ (১১৬)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র শানে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি তালাশ করা কিংবা বর্ণনা করা কুফুরী।

মাছআলাঃ (১১৭)

মিথ্যা বলা ঈমানে অন্ধকার বাড়ায়, নামায পড়লে ঈমান শক্তিশালী হয়, সবসময় পবিত্র থাকা ঈমানে শক্তি আনে, ঈমানের স্থান আশা ও নিরাশার মাঝখানে। ঈমান সংক্ষেপ ও বিস্তারিত আকারে বিশ্বাস করতে হয়। সংক্ষেপ ঈমান হল, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনা তার পবিত্র নাম ও তার উচুঁমানের গুণাবলিসহ এবং তার সকল বিধানকে মেনে নেওয়া।

আর বিস্তারিত হল, আমি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি যার কোন উপমা নেই এবং ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা তাদেরকে আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন তারা নিষ্পাপ, তারা আল্লাহর আনুগত্যে হুঁশিয়ার। ফেরেশতাদের গণনা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কিন্তু তাদের মাঝে চারজন ফেরেশতা বড় ১, হযরত জিব্রাইল (আ:) তিনি নবীদের নিকট অহী পাঠান। ২. হযরত মিকাইল (আ:) তার উপর বৃষ্টি বর্ষনের দায়িত্ব রয়েছে। ৩. হযরত ইসরাফিল (আ:) তার উপর সিঙ্গা ফুঁক দেওয়ার দায়িত্ব অর্পিত। ৪. হযরত আযরাইল (আ:) তাকে রূহ কব্জ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ চার ফেরেশতা সকলের চেয়ে বড়। তাদের নাম সম্মানের সাথে নেওয়া যারা তাদের প্রতি সামান্যতম ঘৃণা পোষণ করে সে কাফির। তৃতীয়ত, নাযিলকৃত সকল কিতাবের প্রতি ঈমান আনা তা হল একশ চারটি তা থেকে চারটি বড় বড়। ছোট কিতাবকে সহীফা বলা হয়। প্রথমঃ তাওরাত যা হযরত মুসা (আ:) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। ২. যাবুর যা হযরত দাঊদ (আ:) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে ৩. ইঞ্জিল যা হযরত ঈসা (আ:) এর উপর অবতীর্ণ

হয়েছে ৪. কোরআন শরীফ যা আমাদের বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এ সকল কিতাব সত্য। তবে আমাদেরকে আমল করতে হবে আমাদের কিতাব কোরআনের উপর এবং ঈমান আনতে হবে সকল নবী রাসূলদের প্রতি। হাদিসে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী-রাসূল এসেছে আল্লাহর বান্দাহদের হিদায়ত করার জন্য। কিন্তু তাদের থেকে ৩১৩ জন রাসূল কিছু কিছু নবী রাসুলদের নাম কোরআন ও হাদিসে এসেছে তাদের মধ্যে থেকে প্রধান প্রধান হল: ১. হযরত আদম সফিউল্লাহ (আ:) ২. হযরত নূহ (আ:) ৩. হযরত ইব্রাহীম (আ:) ৪. হযরত মুসা (আ:) ৫. হযরত দাউদ (আ:) ৬. হযরত ঈসা (আ:) ৭. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা সকলে সত্য। তার আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। এদের সকলের প্রতি ঈমান আনতে হবে। তবে আমল শেষ নবী হিসাবে করতে হবে।

ঈমান আনতে হবে কিয়ামতের উপর যা সত্য, তাকদিরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তা সব আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ঈমান আনতে হবে মৃত্যুর পরের উপর অত:পর জীবিত করা হবে তা সব সত্য। এগুলিই ঈমানকে মুফাস্সাল বা বিস্তারিতাকারে ঈমান আনা। তা ঈমানের শর্তও এবং গুণাবলীও। ঈমান মুখে স্বীকার করতে হয় ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। তা বান্দাহর কাজ। সেখানে তাওফীক আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। একজন আকেল বালেগ কাফির পুরুষের উপর ঈমান আনা ফরয, মু'মিনদের জন্য সুন্নাত।

ইসলাম বলা হয় অনুগত্যকে। অর্থাৎ, আল্লাহর বিধানের সামনে নত হওয়া। ইসলামের আট সুন্নাত: ১. খতনা করা ২. দাড়ি রাখা ৩. গোঁফ কাটা ৪. নাকের পশম তোলা ৫. হাত পায়ের নখ কাটা ৬. মাথায় পুরোপরি চুল রাখা বা পুরো মাথা মুন্ডানো কিছু রাখা ও কিছু মুন্ডানো তা হারাম। ইহুদী ও মুশরিকদের তরীকা ৭. বগলের নিচে পরিষ্কার করা ৮. লজ্জাস্থান পরিষ্কার করা এগুলির ইসলামের কাজ। ইসলাম ধর্ম থেকে ইসলামী শরীয়ত উদ্দেশ্য।

শরীয়তে ওয়াজিবঃ

১. রমযান শরীফে ঈদের নামাযে যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা দু'কেজি গম বা তার মূল্য দেওয়া এটিই উত্তম।

ফায়দাঃ নাবালেগ ছেলে হোক মেয়ে হোক যদি সে ঈদের দিন সকালের পূর্বে জন্মগ্রহণ করে বা কেউ মুসলমান হল তেমনি নিজের দাস-দাসী ও গরীব আত্মীয় স্বজন যাদের খরচ সে বহন করে তাদের সকলের পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব। তবে বিবির পক্ষ থেকে আদায় করা ওয়াজিব নয়। কেননা সে তো নিজ মোহরের মালিক বরং সে নিজে নিজের ফিতরা আদায় করবে বা স্বামীকে নিজের মোহর থেকে আদায় করতে বলবে। যদি কোন স্বামী নিজের পক্ষ থেকে আদায় করে দেয় তখনও তা বৈধ হবে। কোন পাপ হবে না তবে তা তার উপর আদায় করা ওয়াজিব নয়।

২. কোরবানী করা। ৩. প্রতিরাতে বিতরের নামায আদায় করা। ৪. নিকট গরীব আত্মীয়দের খরচ বহন করা।

মাছআলাঃ (১১৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ও কাজকে সুন্নাত বলে। তা তিন প্রকার ১. সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, যে কাজ তিনি সবসময় করেছেন এবং আদেশও দিয়েছেন এবং সে কাজকে ঈচ্ছাকৃতভাবে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন যাতে উম্মতের উপর তা ফরয হয়ে না যায়। তা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ নামে পরিচিত। ২. আর যে কাজকে তিনি দু'একবার আদায় করেছেন বা মাঝে মাঝে করেছেন তাকে সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়। ৩. যে কাজকে সাহাবায়ে কেরাম রাসুলের সামনে করেছেন তিনি তা দেখে নিশ্চুপ ছিলেন বা খুশি প্রকাশ করলেন ও নিষেধ করলেন না তাকে সুন্নাতে মুস্তাহাব্বা বলা হয়।

মাছআলাঃ (১১৯)

প্রখ্যাত আলিমগণ বের করলেন যে, ইহুদীদের বিশ্বাস ছিল যে, যারা তাদের বিরোধী তাদেরকে কষ্ট দেওয়া পূর্ণের কাজ, তারা সাধ্যমতে তাদেরকে

হত্যা করা, সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া, বিভিন্ন পন্থায় তাদেরকে কষ্ট দেওয়া ওয়াজিব মনে করে। একই বিশ্বাস রয়েছে মুসলমানদের মাঝে কিছু শিয়া ও রাফেযীদের নিকট। কিন্তু যে সকল মুসলমান তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর প্রতিষ্টিত তারা কিন্তু তা অত্যন্ত খারাপ মনে করেন, এরকম জালিমদেরকে দোযখী মনে করেন। তাই ইহুদীরা তাদের সে খারাপ বিশ্বাসের কারণে মুসলমানদের বিরোধিতা করেন। কিন্তু খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস ইহুদীদের বিপরীত তাদের নিকট কাউকে কষ্ট দেওয়া হারাম।[৪৯]

মাছআলাঃ (১২০)

তিরমিযী শরীফে রয়েছে, হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বিদায় হজ্বের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসওয়া নামক উঠের উপর সওয়ার হয়ে বলেছিলেন। হে লোক সকল! আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি যদি তা তোমরা আকড়ে ধর তখন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল, আল্লাহর কিতাব ও আমার পরিবার।

আমি বলি, এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের দিকে ইশারা করেছেন; কেননা তারা বেলায়তের স্তম্ভ। তাদের প্রথম হল, হযরত আলী (রাঃ) অতঃপর তার সন্তানরা, তাদের শেষ হল গাওছুস ছাকালাইন মহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জিলানী। তাই দুনিয়াতে কেউ তাদের মাধ্যম বিহীন বেলায়তের মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। মুজাদ্দেদী (রহঃ) এটাই বলেছেন। তাই এ উম্মতের সকল অলী ও আলিমগণ তার পরিবারের অনুসারী উত্তরাধিকার সুত্রে।[৫০]

আমি বলি, এ উম্মতের পুরুষরা অধিক শক্তিশালী ও হিদায়তপ্রাপ্ত পূর্বের উম্মতের চেয়ে। বেলায়তের কুতুব হলেন, হযরত আলী (রাঃ) পূর্বের সকল উম্মতের অলীরাও তার আত্মার মাধ্যমে বিভিন্ন মর্যাদা লাভ করেছেন। সেই মর্যাদা তার পরে তার ছেলে হাসান ও পরে আব্দুল কাদের জিলানীতে বিদ্যমান ছিল। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সে মর্যাদায় ভূষিত থাকবেন। তাই বলা

[৪৯]. মওয়াহেব, পারাঃ৬, মায়েদাহ
[৫০]. মাযহারী, খ, ৪ পৃঃ১০৩

হয়, সকলের সূর্য ডুবে গেছে; কিন্তু আমাদের সূর্য কখনো অস্তমিত হবে না।[৫১]

মাছআলাঃ (১২১)

মাযহাব ও মুরীদ কিসের?

মাযহাব হযরত ইমাম আবু হানিফার এবং মুরীদ সায়্যিদুনা গাউছে আযম আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) এর ।

যেমন কবি বলেন,

بندہ پروردگارم ☆ امت احمد نبی

یابع چہاریار ☆ تابع اولاد علی

مذہب حنیفہ دارم ☆ ملت حضرت خلیل

خاکہاے غوث اعظم ☆ زیرسایہ ہرولی

অর্থঃ আমরা আল্লাহর বান্দাহ, আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মত। চারখলিফার অনুসারী ও আলীর বংশের অনুসারী। মাযহাব হানাফী মিল্লাত ইব্রাহীম খলিলের। গাউছে আযমের মাটি সকল অলীদের উপরে।

কেরাত ও তাজবীদের বর্ণনা

মাছআলাঃ (১২২)

যদি কেউ **الحمدلله** এর স্থলে **الهمد لله** (অর্থাৎ **ح** এর স্থলে **هـ** অক্ষর দ্বারা) উচ্চারণ করে এ ধরনের উচ্চারণ করা জায়েজ আছে কি? এর দ্বারা কি নামাজ বাতেল হবে?

এ ধরনের উচ্চারণ করাকে **عجمی** তথা অনারবী লোকদের বেলায় **الضرورات تبيح المحظورات** (অপারগতা অবস্থায়) হিসাবে জায়েয বলে

[৫১]. তাফসিরে মাযহারী, খ, ৪, পৃ:১২০

আলেমগণ মতপোষণ করেছেন। তবে এটি উত্তম নয় এবং এ মাছআলার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলেমদের **(علماء متقدمين ومتأخرين)** মধ্যকার মতনৈক্য রয়েছে।

فيمن قرأ الهمد لله بالهاء فجرم الشيخ ابن حجر بالبطان، لكن جزم بالصحة شيخه زكريا وافتى بالصحة القاضى وابن الرفعه. [৫২]

মাছআলাঃ (১২৩)

উচ্চ আওয়াজে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা মাকরুহ।

ينا فى الخشوع ولان فيه رياء

কেননা এতে বিনয় নম্রতা থাকে না, আর এতে অহংকার ও রিয়া বেশী হয়; যা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়।

মাছআলাঃ (১২৪)

নফল নামাজ হতে কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের শিক্ষাদান করা উত্তম। অর্থাৎ কোরআন শরীফের শিক্ষা অর্জন করা নফল নামাজ পড়া হতে উত্তম, আর এই উভয় হতে ইলমে ফিকাহ অর্জন করা অধিকতর উত্তম।

লাউড স্পীকার দ্বারা নামাজ আদায়ের বর্ণনা

মাছআলাঃ (১২৫)

লাউডস্পীকার দ্বারা নামাজ আদায় করা জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্ত আরবদেশ সমূহের আলেম উলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেছে, তবে হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কোন কোন আলেম এটি নাজায়েয বলেছেন। কেবলমাত্র খোতবা ও ওয়াজ নছিহত ইত্যাদির ক্ষেত্রে জায়েয বলেছে। তাদের মতে লাউডস্পীকার দ্বারা নামাজ আদায়ে **خشوع**

[৫২]. **(الترياق النافع صفه ৩১)**

وخضوع (এক মনস্ক ও ধ্যান ধারণা) এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। অর্থাৎ মুসল্লীরা অন্য মনস্কে চলে যায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের একদল লাউড স্পীকার দ্বারা নামাজ আদায় করা **بدعت سيئه** (নিকৃষ্ট বেদাত) বলে মতপোষণ করেছে। আবার অন্য আর একদল জায়েযের পক্ষে অবস্থান করেছে। বাস্তবিক পক্ষে এতে মত পার্থক্যের কারণ হচ্ছে এই- স্পীকারের আওয়াজ ও শব্দ কি **بازگشت** (প্রতিধ্বনি শব্দ) না নয়? গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে-এটি মুল আওয়াজ ও কণ্ঠ, কাজেই এর দ্বারা নামাজ **عـدم جواز** (জায়েয না হওয়া) এর কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

নির্দিষ্ট ও স্থায়ীভাবে যদি এ ধরণের লাউডস্পীকার হয় যা মিশিনের ন্যায় দেয়াল কিংবা অন্য কোন জায়গার উপর স্থাপন করা হয়ে থাকে, আর যদি স্পীকার বিকল কিংবা নষ্ট হওয়ার কারণ হয় এবং এশা ও ফজরের নামাজ আদায় করার সময় বিদ্যুৎ বিভ্রাটও চলে যায় তাহলে কি জটিলতা সৃষ্টি হবে না? অতএব যেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিদ্যুৎ চলে গেলে ব্যাটারী ইত্যাদির মাধ্যমে লাউডস্পীকার চালু রাখার ব্যবস্থা থাকে তবে তাতে অসুবিধার কিছু নাই। তাও আবার বড় জমায়াতের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট, ছোট-খাট জামাতের জন্য আবশ্যক নয়। কিছু সংখ্যক গোঁড়ামী লোক নামাজ, খুতবা ও ওয়াজ-নসিহত সমস্ত কিছুই মাইকযোগে করাকে নাজায়েয ও হারাম বলে থাকে। লাউডস্পীকার দ্বারা এই সমস্ত লোক আল্লাহর নেয়ামত ও কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এবং অবস্থার ও যুগের বাস্তবতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বেখবর তাদের সাথে কোন কথা নাই। আবার কতেক সতর্কতাবাদীরা **خشوع وخضوع** (ধ্যান ও মনস্ক) এর মধ্যে পার্থক্য ও অন্য মনস্ক হওয়ার কারণে শুধুমাত্র নামাজের ক্ষেত্রে মাইক ব্যবহার করা অপছন্দ করেন।

মাছয়ালাঃ (২২৬)

লাউড স্পিকার নিয়ে নামায আদায়ঃ

লাউড স্পীকার দিয়ে নামায আদায়ে দু'টি দল রয়েছে। কিছু আলিমগণ বলেন, লাউড স্পীকার দ্বারা বিনয় থাকে না এবং তা প্রতিধ্বনি এবং

কানেকশান ছুটে যাওয়ার আশংখা রয়েছে তা দ্বারা মুসল্লিদের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় অনেক সময় মসজিদ ছোট হয় তাতে তার প্রয়োজন হয় না যেখানে স্পীকারের প্রয়োজন হয় না, মুকাব্বির যা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত তা উঠে যায় তাই তা বিদ'আতে সায়্যিয়াহ।

অন্যান্য আলিমগণ বলেন, সকল আরব ওলামাদের নিকট তা বৈধ। তা প্রতিধ্বনি নয়। বর্তমানে এমন অনেক লাউড স্পীকার বের হয়েছে যা মেশিনের মত দেওয়ালে বা কোন অন্য বস্তুতে লাগিয়ে দেওয়া হয় তখন ইমাম ও মুক্তাদীও টের পায়না নামায যে লাউড স্পীকারে হচ্ছে এবং যেখানে বিদ্যুতের সাথে ব্যাটারিরও ব্যবস্থা রয়েছে। তখন তাতে কোন অসুবিধা নেই। বিশেষ করে যখন লোক বেশী হবে। তবে মুকাব্বির সুন্নাত। স্পীকার থাকুক বা না থাকুক। আমার তদন্ত মতে খুতবা, ওয়ায, আযান ও অন্যান্য ঘোষনা ব্যতীত শুধুমাত্র নামায লাউটস্পীকার ছাড়া আদায় করা উত্তম।

পোশাক পরিধানের বর্ণনা

মাছআলা: (১২৭)

اسبال (আছ্বাল) অর্থাৎ পায়জামা কিংবা তাহ্বন্দ লম্বা হওয়াটা যদি অহংকার ও গৌরব হিসেবে হয় তবে নিঃসন্দেহে গুনাহ ও নাজায়েয। এ ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে **وعيد** তথা শাস্তির যোগ্য বলে এরশাদ করা হয়েছে। আর যদি অহংকার ও আত্মগৌরব হিসেবে না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কোন সন্দেহ ছাড়াই জায়েয। যেমন- আজকাল অবহেলার কারণে ও ফ্যাশন, রছম এবং রেওয়াজ হিসাবে রাখা হয়ে থাকে।

পায়ের গোড়ালীর নিচে পায়জামা লম্বা রেখে নামাজ আদায় করা কোন প্রকার মাকরূহ ব্যতীরেখে জায়েয ও দুরস্ত। উক্ত মাছআলা সাধারণ মানুষ তাদের মনগড়া হিসাবে বানিয়ে নিয়েছে, যে নামাজের সময় পায়জামা

গোড়ালীর উপরে করে নামাজ আদায় করে। পায়জামা গোড়ালীর উপরে তোলা নামাজ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়।

আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেজা খান (রহঃ) এবং শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভী (রহঃ) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন; যদি অহংকার ও আত্মগৌরব হিসাবে না হয় তাহলে জায়েয। উক্ত মাছআলা দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যদি আলীশান ও মনোরম সৌন্দর্য মন্ডীত বিল্ডিং নিজে থাকার জন্য তৈরী করাটা যদি অহংকার ও আত্মগৌরবের উদ্দেশ্যে ও নিয়্যতে হয় তবে তা নিষেধ ও গোনাহ।

আর যদি অহংকার ও আত্মগৌরবের নিয়্যতে না হয় তা হলে জায়েয ও মুবাহ। তাছাড়াও হাদীস শরীফে রয়েছে; "যখন কোন ব্যক্তি সাত গজের উপরে দেওয়াল (প্রাচীর) উঠায় তখন ফেরেশতাগণ বলে থাকেন হে মোনাফেক আর কত উঁচু উঠাবে।"

উক্ত হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে; যে ব্যক্তি অহংকার, আত্মগৌরব ও লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে বাসস্থান তৈরী করে তাদের জন্য **وعيد** তথা শাস্তির কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে অহংকার ও গৌরবের নিয়্যতে না হলে তা জায়েয ও বৈধ। অধিকাংশ হাদীস ব্যাখ্যাকার এ সমস্ত হাদীসের সারকথা ও মর্মার্থ ইহাই বর্ণনা করেছেন। যা আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে উপরোল্লেখ করেছি।[৫৩]

পায়জামা ও তাহ্বন্দ পায়ের গোড়ালীর নিচে হওয়াকে আরবী ভাষায় **اسبال** (আছ্বাল) বলা হয়। যদি পায়ের গোড়ালীর নিচে পায়জামা ও তাহ্বন্দ হওয়াটা অহংকার ও গৌরব হিসাবে হয় তবে তা হারাম ও নিষেধ, এর উপর কঠিন শাস্তির কথা হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আর যদি অহংকার ও গৌরব হিসাবে না হয় তাহলে হাদীসের দৃষ্টিতে তা জায়েয।

[৫৩]. ফতোয়ায়ে রেজভীয়া, খন্ড-১০, পৃষ্ঠা ৯৯

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) আরজ করলেন; এয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার পায়জামার দামান এক পার্শ্বে লম্বাভাবে ঝুলিয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, তুমি তাদের মধ্যে গণ্য নয়। অর্থাৎ তুমি **وعيد** তথা কঠিন শাস্তির যোগ্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত নয়।

এক কথায় যারা অহংকার ও গৌরব হিসাবে পায়ের গোড়ালীর নীচে কাপড় পরিধান করবে তারা শাস্তির যোগ্য এবং এ রকম করাটা হারাম। তবে আলেমগণ অহংকারের বেলায় মাকরূহে তানজীহির হুকুম দিয়েছে।[৫৪]

ফিকহের সাথে সংশ্লিষ্ট আলেমগণ মনে করে, মাকরূহে তানজীহি কর্ম জায়েয হয়ে থাকে। ইহা হারাম ও মাকরূহে তাহরীমি বলা নিম্ন স্তরের অজ্ঞতা।[৫৫]

মৃতের কাফনের বর্ণনা

মাছআলাঃ (১২৮)

পুরুষ মৃতের কাফনের জন্য তিন কাপড়। তন্মধ্যে দু'টি চাদর যা হচ্ছে- (১) ইজার (২) লেফাফা, আর (৩) কামিজ, যাকে কাফনি বলা হয়। এগুলো হচ্ছে সুন্নাত।

আর মহিলা মৃতের ক্ষেত্রে আরো অতিরিক্ত দু'টি কাপড় রয়েছে; (১) ওড়না (২) সিনাবন্দ। এই পাঁচ কাপড় মহিলার জন্য, এর অতিরিক্ত নয়।

শিশুদের ক্ষেত্রে কাফনের জন্য একটি কাপড়ই যথেষ্ট।

পুরুষের কাপন পরিধানের নিয়মঃ প্রথমে কাপড়ের তিনটি তাগা যা দ্বারা কাপন বাধা হয়। প্রথমটি পায়ের নিকট, দ্বিতীয়টি কোমর বরাবর। আর তৃতীয়টি মাথার দিকে রাখবে। অত:পর এর উপরে একটি চাদর বিছিয়ে

[৫৪].(ফতোয়ায়ে রেজভীয়া)

[৫৫]. ফতোয়ায়ে বরকাতুল উলুম, পৃষ্ঠা-৬৬ ও ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৯

দেবে। যেটি বড় চাদর যা মৃতের মাথা এবং পায়ের বাইরে থাকবে যাতে তাগা দ্বারা বাধা যায়। আর এই চাদরটি তিন গজ কিংবা পৌনে তিন গজ লম্বা হতে হবে। যার নাম লেফাফা। এর উপরে দ্বিতীয় চাদর ইজার বিছিয়ে দেবে। এর উপরে তৃতীয় কাপড় যা কামিজ কিংবা কাপনি বা কোর্তা এটি মধ্যভাগে অর্ধেক বিছিয়ে দিবে আর বাকী অর্ধেক মাথার দিকে রেখে দিবে, অত:পর মৃতকে কাপনের উপর রেখে মাথা ও দাঁড়িতে আতর লাগাবে, নাখ, এবং উভয় হাতের তালু উভয় কনু এবং পায়ের তালুতে কাফুর লাগানোর পর কামিজের বাকী অংশ মাথার দিক হতে গলায় এনে নিচের দিকে রেখে দিবে।

উত্তম হচ্ছে উপর থেকে পরিধান করা। অত:পর উভয় চাদর এমন ভাবে বিছাবে বাম অংশ কাপড়ের নিচে আর ডান অংশ কাপড়ের উপরে রাখবে অত:পর তাগা তিনটি, একটি পায়ের বাইরে, দ্বিতীয়টি কোমরে আর তৃতীয়টি মাথার বাইরে বাধবে।

মহিলার কাফনের ক্ষেত্রে লেফাফা ও ইজার চাদর বিছায়ে এর উপর সিনা বন্দ বিছাবে অত:পর জামা বা কামিজ যা মাঝখানে কাটা থাকবে এরপর ওড়না দ্বারা মাথা ঢেকে দিবে। তবে বাঁধার তাগা তিনটি প্রথমে বিছাতে হবে। একটি মাথার বাইরে, একটি পায়ের বাইরে আরেকটি কোমর বরাবর। মৃতকে পাঁচটি কাফনের উপর রেখে অর্থাৎ পাঁচ কাপড়ের উপর শোয়ায়ে কাফনের উপর কাফুর দিবে অত:পর মাথার চুল অর্ধেক অর্ধেক উভয় দিকে ওড়নার উপর ভাগ করে সিনায় রাখবে এরপর সিনাবন্দ অত:পর চাদর গুলো একটা একটা চাদর আবৃত করে দিয়ে সর্বশেষ তাগা তিনটি বেঁধে দিবে।

বি:দ্রঃ–

লেফাফা: যে চাদরটি বড়। যা মৃতের মাথা ও পায়ের বাইরে লম্বা থাকে যাতে করে তাগা দিয়ে বাঁধা যায়। এটি তিন গজ কিংবা পৌনে তিনগজ লম্বা হবে।

ইজারঃ যাকে তাহবন্দ বলা হয়। এটি মাথা হতে পা পর্যন্ত লম্বা। যা পৌনে তিন গজ লম্বা।

কামিজঃ আড়াই গজ। যা কাঁধ হতে হাঁটু পর্যন্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, কামিজ, কাফনি ও দেরা এই তিনটি একই কাপড়ের নাম। যাকে কামিজ বলা হয়।

মহিলার ক্ষেত্রে দু'টি কাপড় অতিরিক্ত। (১) খেরকা বা সিনাবন্দ (২) খেমার বা ওড়না।

সিনাবন্দ তিন হাত অর্থাৎ পৌনে দু' গজ লম্বা হবে। আর ওড়না দু'হাত অর্থাৎ দেড় গজ লম্বা, দু' বিঘত তথা এক হাত চওড়া। উল্লেখ্য যে এ সমস্ত কাপড় আড়াই হাত বরের হবে। কেননা এ সমস্ত কাপড়ে মৃতকে শোয়ায়ে এর দ্বারা আবৃত করা হয়।

মাছআলাঃ (১২৯)

ইমাম শাফেয়ীর মতে সম্মানিত পুরুষ মৃতের জন্য পাগড়ি বাঁধা যাবে। যা লম্বা দেড় গজই যথেষ্ট।

তাছাড়া একটি কাপড়ের ছোট টুকরা ইমামের মুসল্লার জন্য। আর একটি বড় চাদর মৃতের খাটিয়ার উপর ঢেকে দেয়ার জন্য। যা তিন গজ হবে। আরেকটি তাহবন্দ অতিরিক্ত যা মৃতকে গোসল দেয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য। দু'টি থলে হাতে পেছানোর জন্য, আর সামান্য কাপড় মৃতের শরীর মুছার জন্য। সাধারণতঃ ষোল গজ কাপড় দ্বারা এ সমস্ত কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে।

মৃতকে কবরে রাখার বর্ণনা

মাছআলাঃ (১৩০)

মৃতকে কবরে রাখার পর ডান পার্শ্বে মাটির ঢিলা দ্বারা ঠেস লাগিয়ে কেবলামূখী করে দিবে এবং কাফনের বাঁধন খুলে দিতে হবে।

আর যদি মৃত মহিলা হয় সেক্ষেত্রে কবর মাথার দিক হতে বন্ধ করা আরম্ভ করবে। আর যদি পুরুষ হয় তবে কবর পায়ের দিক হতে বন্ধ করবে। (তাজহির ও তাকফিন)

মাছআলা: (১৩১)

কবরে মাটি দেওয়া মাথার দিক হতে আরম্ভ করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি তিন তিনবার উভয় হাতে মাটি নিয়ে কবরে ঢালবে। প্রথম বার **مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ** দ্বিতীয় বার **وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى** আর তৃতীয় বার **وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ** পাঠ করবে। মাটি ঢালার পর কবরে পানি ছিটিয়ে দেওয়া এবং কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মৃতের জন্য দোয়া, মাগফিরাত করা কিংবা কুরআন মজিদ পাঠ করে ছাওয়াব পৌঁছানো মুস্তাহাব।

লাশ বহন, কবর যিয়ারত ও তাল্‌কীন এবং লাশ স্থান্তর ইত্যাদির বর্ণনা

মাছআলা: (১৩২)

নেককারদের কবর যিয়ারতের আদাব: কবরকে পিঠ দিয়ে মৃতের চেহারার দিকে তাকাবে এবং পড়বে:

اللهم آنس وحشتهم و آمن روعتهم و لقن حجتهم و ارحم غربتهم و تقبل حسناتهم و كفر سيئاتهم

বসে ডান হাত কবরের মাটিতে রেখে এই দু'আ পড়বে:

اللهم اغفر له فإنه قد افتقر إليك

যদি কোন বুযুর্গের কবর যিয়ারতের সুযোগ হয় তখন সালামের পরে যদি সম্ভব হয় তখন তার চুতুর্পাশে তিন চক্কর লাগাবে।[৫৬]

মাছআলাঃ (১৩৩)

যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কবর যিয়ারত করবে এবং এই দু'আ পড়বে,

اللهم إنى أسألك بحق محمد و آل محمد ان لاتعذب هذا الميت

তখন আল্লাহ পাক সে কবর থেকে কিয়ামত পর্য়ন্ত শাস্তিকে মওকূফ করে দেবেন।[৫৭]

মাছআলাঃ (১৩৪)

ফতওয়ায়ে হুজ্জত ও ওমদাতুল আবরারে এসেছে, হযরত জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, যখন কোন নেককার জান্নাতী লোক মারা যায়, তখন তার জানাযা বহনকারী ও তাঁর পেছনে যারা চলে এবং যারা জানাযাতে শরীক হবে এসকল লোককে আযাব দিতে আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন।

মাছআলাঃ (১৩৫)

হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন মুসলমান কোন মুসলমানের কবরে দিয়ে গমন করে তখন সে এই দু'আ পড়বে-

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوْتُ أَبَدًا بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ.

তখন মহান আল্লাহ পুরো কবরস্থান থেকে অন্ধকার ও ভয় দূর করে দিয়ে আলোকিত করে দেবেন এবং দু'আ পাঠকারীর আমলনামায় এক লক্ষ নেকী লিখা হবে এবং তার আমলনামা থেকে একলক্ষ গুনাহ দূর করে দেওয়া হবে।

[৫৬]. দসতুর:মুহাম্মদ তিবরিযী, পৃ:১৫২।
[৫৭]. দসতুর:১৫২।

মাছআলাঃ (১৩৬)

মৃতের পরিবারের নিকট খাবার পাঠানো কিছু মাশায়েখ মাকরূহ বলেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হল তাতে দোষের কিছু নেই; বরং তা মুস্তাহাব।

মাছআলাঃ (১৩৭)

হাদিসে এসেছে,

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأن محمدا رسول الله .

এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায়, মৃতকে তালকীন করা মুস্তাহাব। তা করা হবে মৃত্যুর যন্ত্রণা হওয়ার সময় ও দাফনের পরে। এ হাদিস দ্বারা উভয়টি বুঝা যায়। তাই ফুকহাগণ উভয়টি নিয়েছেন। তাই আমরা মৃত্যুর সময় ও দাফনের পরে তালকীন উভয়টি করি। সকল ইমামগণের মতে কবরে প্রশ্ন করা হক। তবে মুতাজিলা সম্প্রদায় ব্যতীত। তারা এটি স্বীকার করে না।

ফতওয়ায়ে বুরহানিয়াতে এসেছে, তালকীন দাফনের পরে। কিছু মাশায়েখ বলেছেন তা কিছু দেশে বিদ্যমান। শমসুল আয়িম্যাহ হালওয়াই থেকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছে, তখন তিনি বলেন, যেখানে মানুষের সে অভ্যাস গড়ে উঠেছে তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়, আর যেখানে তা নেই সেখানে করার আদেশ দেওয়া যাবে না।

মাছআলাঃ (১৩৮)

যে ব্যক্তি প্রতিদিন ইশার নামাযের পরে সূরায়ে মূলক পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরের আযাব থেকে ও মুনকার নকীরের প্রশ্ন থেকে মুক্তি দান করবেন।

মাছআলাঃ (১৩৯)

দাফনের পরে কবর থেকে ওযর শরয়ী ব্যতীত লাশ বের করা যাবে না।

মাছআলাঃ (১৪০)

কবরে মাটি ঢালা জরুরতের ভিত্তিতে বৈধ। ছিদ্র বন্ধ করা নিষেধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একসময় নিজ ছেলে ইব্রাহীমের কবরে পাথর দেখলেন তখন তিনি তা ঠিক করে দেন।

মাছআলাঃ (১৪১)

বিশেষ করে আউলিয়ায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারত করা ও সাধারণ মুসলমানদের কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব আমলী। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সব সময় কবর যিয়ারত কর এবং ময়দানে হাশরের অবস্থার ভয় অর্জন কর।[৫৮]

মাছআলাঃ (১৪২)

মহিলাদেরকে করব যিয়ারত নিষেধ করেছেন এমনকি আউলিয়ায়ে কেরামের কবরও।[৫৯]

মাছআলাঃ (১৪৩)

ফতোওয়ায়ে নাসাফীতে রয়েছে, মু'মিনদের রূহ প্রত্যেক দিনরাত নিজ ঘরের সামনে আসে সে ব্যথিত কণ্ঠে ঘর বাসীদেরকে আওয়াজ দেয় যাতে তারা সদকা ও মেহেরবানী দ্বারা তাদের কল্যাণ পৌঁছায়।[৬০]

যখন সে তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো দান খায়রাত পায়না তখন সে পেরেশান হয়ে ক্রন্দন করে বদ দোয়া দিতে দিতে চলে যায়।[৬১]

মাছআলাঃ (১৪৪)

---

[৫৮]. তুহফাতুর রযীয়াঃ৯৫।
[৫৯]. তুহফাতুর রযীয়াঃ৯৫।
[৬০]. দসতুরঃ১৫৬।
[৬১]. দসতুরঃ১৫৬।

ফতোওয়ায়ে সিরাজিয়াতে রয়েছে, নবীদেরকে কবরে আপন উম্মতের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে তারা তাদেরকে কোন অবস্থায় ছেড়ে এসেছে?

মাছআলা: (১৪৫)

কোন মৃতকে দাফনের পূর্বে এক দু মাইল স্থানান্তর করা বৈধ।[৬২]

মাছআলা: (১৪৬)

এক শহর থেকে দ্বিতীয় শহরে মৃতকে স্থানান্তর করা বৈধ। ফতওয়ায়ে হুজ্জতে রয়েছে, ফকীহ আবু জাফর হিন্দওয়ানী বুখারায় ইন্তেকাল করেছেন, তখন তাকে উমদাতুল আবরার শহরে নেওয়া হল। যেমন হযরত ইয়াকুব (আ:) মিসরে ইন্তেকাল করেন তখন তাকে ফিলিস্তিনে নেওয়া হল, মুসা (আ:) ইউসুফ (আ:) এর তাবুতকে মিসর থেকে ফিলিস্তিনে নিয়েছেন যাতে তার হাড্ডি তার পূর্ব পুরুষের হাড্ডির সাথে থাকে। (দস্তুর:১৫৫)

এ ইবারত দ্বারা বুঝা যায়, কোন লোক যদি কোন শহরে মারা যায় তখন তাকে তার পূর্ব পুরুষের কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া বৈধ।

মাছআলা: (১৪৭)

কবর বা মাযারে কোরআন পড়া ইমাম আবু হানিফর নিকট মাকরূহ, আর ইমাম মুহাম্মদের নিকট বৈধ।[৬৩]

মাছআলা: (১৪৮)

কবরে প্রশ্ন-উত্তর কবরের শাস্তি ও কবরের মাটির চাপ সত্য। মু'মিনদের কবরে রাসূলের হাযির সত্য। যেমন হাদিসে এসেছে মৃতকে প্রশ্ন করা হবে এর ব্যাপারে তুমি কি বল? এখানে ইসমে ইশারা নিকবর্তীর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যা দ্বারা চাক্ষুষ বস্তুর দিকে ইশারা করা হয়। তাই এখানে ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই এবং একসময় নবী সাল্লাল্লাহু

[৬২]. দসতুর:১৫৪।
[৬৩]. দসতুর:১৬৭।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থানে তাশরীফ নেওয়া অসম্ভব নয়। তা চাই প্রতিচ্ছবি আকারে হোক বা শারীরিক আকারে হোক। কেউ বলে, এখানে অন্তর খেয়াল করা নিয়েছেন, অনেকে সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা নিয়েছেন।

নবী ﷺ 'র জানাযার নামায ও দাফনের বর্ণনা

মাছআলাঃ (১৪৯)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জানাযার নামায কিভাবে পড়া হয়েছে এ ব্যাপারে সঠিক মত হল যা সিরাতের কিতাবে এসেছে, যা হানাফী ও শাফেয়ীর মূলনীতির আলোকে মিল, তার জানাযার নামায প্রচলিত প্রসিদ্ধ মতে পড়া হয়েছে; কিন্তু সেই জানাযাতে কেউ ইমাম ছিল না এবং সেখানে আমরা যে দু'আ পড়ি তা পড়া হয়নি বরং তার স্থানে তার প্রশংসা করা হয়েছে।

এই মাছআলাটি হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। ইমাম কুসতুলানী শায়খ যাইনুদ্দীন মুরাগী, আল্লামা যুরকানী ও শাফেয়ী ও হানাফীদের অধিকাংশ আলিমদের নিকট জানাযার নামায প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে হয়েছে। তবে তার জানাযার ব্যাপারে আমিলমদের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন প্রসিদ্ধ পদ্দতিতে নামায হয়নি; বরং মানুষেরা দলে দলে প্রবেশ করেছে এবং সালাত সালাম পড়ে চলে গেছেন। আল্লামা রাযী প্রসিদ্ধ পদ্ধতিতে নামায পড়ার কারণ বর্ণনা করেছেন তাকে আল্লামা যুরকানী রদ করেছেন। তিনি বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জানাযার উদ্দেশ্য ক্ষমার দু'আ করা নয়; বরং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাই সেখানে ক্ষমার দু'আ পড়া হয়নি।

আল্লামা রাযী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জানাযার নামায না পড়া শহীদদের সাথে তুলনা করেছেন। অথচ তা ভূল; কেননা হাদিস দ্বারা শহীদদের জানাযার নামায পড়া প্রমানিত। ইমাম বুখারী (রা:) ওকবা ইবনে আমের থেকে এ ব্যাপারে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম কাযী আয়ায বর্ণনা করেন, অনেক আলিমগণ প্রচলিত পদ্ধতিতে নামায পড়ার কথা বলেন। তাই বিশুদ্ধ।

হযরত আবু বকর (রা:) উম্মতের ফিতনা দমনে ব্যস্ত ছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত লোক তার হাতে বায়য়াত গ্রহণ করেননি মানুষেরা দলে দলে সেখানে প্রবেশ করতেন এবং জানাযার নামায পড়েছেন যখন বাইয়াত শেষ হল তখন শরীয়তের অলী তিনি হলেন, তিনি জানাযার নামায পড়েছেন তার পড়ার পর আর কেউ পড়েননি কেননা; অলীর জানাযার পরে আর জানাযা নেই।

ইমাম সুরাখসী মবসুত কিতাবে লিখেন, আবূ বকর (রা:) উম্মতের ফিতনা দমনে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সাহাবারা জানাযা পড়তে রয়েছেন যখন তিনি এসে জানাযা পড়লেন তখন আর কেউ পড়েননি। জানাযার নামাযে ইমাম না থাকার ব্যাপারে ইমাম সুরাখসী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অলী হিসাবে হযরত আবু বকর (রা:) ছিলেন কিন্তু তিনি ভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাই মানুষেরা একা নামায আদায় করলেন। এ ব্যাপারে হযরত ইমাম আহমদ রেযাখানের ফতওয়া ও আল্লামা গোলাম রাসূল সাইদীর কিতাবে বিস্তারিত রয়েছে।

মাছআলা: (১৫০)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে ইন্তেকাল করেন, বুধবারে তাকে দাফন করা হয়েছে।

মাছআলা: (১৫১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে সোমবারে ছাশতের শেষ সময় ইন্তেকাল করেছেন এবং বুধবারে অর্ধ রাতে দাফন করা হয়েছে।[৬৪]

[৬৪]. দুসতুর:১৮৪।

এক বর্ণনায় এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউস সানীর সোমবারে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং রবিউল আউয়াল মাসের সোমবারে ইন্তেকাল করেছেন অর্থাৎ, জন্মের মাসের মতানৈক্য রয়েছে। তবে প্রসিদ্ধ মত হল, তিনি রবিউল আউয়ালের বার তারিখ সোমবারে হাতির ঘটনার বছর জন্ম গ্রহণ করেছেন।

ইছালে ছাওয়াবের বর্ণনা

মাছআলাঃ (১৫২)

মৃতের ওসীয়ত ব্যতিত তার সম্পদ থেকে ব্যয় করা এটি তার ওয়ারিশদেরকে সম্পদ হতে বঞ্চিত রাখা। এটি যেন না হয়। বিশেষতঃ নাবালেগ ছেলে-মেয়েদের প্রতি খেয়াল রাখা আবশ্যক। যদিওবা কোন প্রকার নফল দান-খয়রাত করতে চায়, তা বালেগগণ তাদের পক্ষ হতে করবে।

মাছআলাঃ (১৫৩)

ইছালে ছাওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা খাবানো, টাকা-পয়সা দান করা, কাউকে কাপড় দেওয়া, কুরআন শরীফ খতম পড়ানো। আর যদি এ সমস্ত কিছু করার সামর্থ না হয় তাহলে কেবল সূরায়ে আল্-হামদু শরীফ, সূরায়ে ইখলাস শরীফ কিংবা কালেমা শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে মৃতের আত্মীয় হউক কিংবা অন্য কেউ হউক, বুযুর্গ হউক অথবা নেক্কার আলেম ফাজেল কিংবা বাচ্ছা সকলের জন্য ছাওয়াব পৌঁছানো যাবে। এ সমস্ত কিছু করা জায়েজ।

মাছআলাঃ (১৫৪)

যদি মৃতের উপর কারো পাওনা থাকে তাহলে মৃতের সম্পদ হতে কিংবা মৃতের আত্মীয়ের পক্ষ অথবা পাওনাদারের নিকট হতে মাফ করে নেওয়া আবশ্যক এবং মৃতকে কর্জ হতে মুক্ত করে দিতে হবে।

ছাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের বর্ণনা

মাছআলাঃ (১৫৫)

হযরাত ছাহাবায়ে কেরাম রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আলাইহিম আজমাঈনের নেক ও ভাল দিক ব্যতীত মন্দ ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ফিসক্ব তথা অন্যায় ও নাফরমানী; কেননা ছাহাবায়ে কেরাম রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহুম মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রব ও সাহচর্যে ছিলেন। কাজেই তাদের জীবনালোচনা উত্তম ও নেক দিক সমূহ দ্বারা করা আবশ্যক, খারাপ ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা ফিসক্ব।

মাছআলাঃ (১৫৬)

সাহাবায়ে কেরাম রিদোয়ানুল্লাহ আলাইহিমদের মধ্যকার বাক বিতন্ডা তথা বিবাদপূর্ণ যে সমস্ত কথাবার্তা হয়েছে সে সমস্ত ঘটনাবলী দেখা ও পাঠ করা সর্ব সাধারণের জন্য দুরস্ত ও জায়িজ নয়। কেবলমাত্র মুহাক্কেক আলেমগণ ব্যতীত।

মাছআলাঃ (১৫৭)

আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামত ও অলৌকিক ঘটনাবলী সত্য ও হক্ব। এর মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের উপকার হয় আর পায়গাম্বর আলাইহিমুস্সালামের মোজেজাও সত্য ও বরহক এর মাধ্যমে মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হয়েছে।

মাছআলাঃ (১৫৮)

দ্বীনের সঠিক পদ-প্রদর্শক, পেশোয়া, তথা সম্মানিত ছাহাবায়ে কেরাম, ইমাম, মোজতাহেদ, ওলামা ও পীর মাশায়েখগণকে সৈয়্যদুনা বলা হয়। যা

পূর্ববর্তী তথা আদিকাল হতে বর্তমান পর্যন্ত সকল উম্মতগণ এর উপর আমল করে আসছে।

হযরত ফারুকে আজম রাদ্বি আল্লাহু তা'য়ালা আনহু এরশাদ ফরমায়েছেন– **ابوبكر سيدنا واعتق سيدنا يعنى بلال** অর্থাৎ হযরত আবু বকর আমাদের ছরদার এবং আমাদের সরদারকে (বেলাল) মুক্ত করেছেন।[৬৫]

মাছআলাঃ (১৫৯)

সাহাবাদের সমালোচনা করা ফিসক।

মাছআলাঃ (১৬০)

সাহাবাদের পরস্পর যে সকল ঝগড়া হয়েছে তা দেখা পড়া সাধারণ লোকের উচিত নয়।

মাছআলাঃ (১৬১)

আউলিয়াদের কারামত হক। তা দ্বারা মুসলিম জাতির ফায়দা হয় নবীদের মু'জেযার মত মানুষকে হিদায়ত করে।

মাছআলাঃ (১৬২)ঃ

কোনো অলী নবীর মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না।

মুসাফির ও মুসাফিরের নামায-রোজার বর্ণনা

মাছআলাঃ (১৬৩)

মুসাফিরের কসরের হুকুম কখন বাতিল ও রহিত বলে গন্য হবে?

উত্তরে বলা যায় মুসাফির যখন ঘরে ফিরে আসবে কিংবা কোন জায়গায় পনর (১৫) দিন অথবা এর চেয়ে বেশী দিন অবস্থানের ইচ্ছা করে তবে

[৬৫]. মুসনাদে আহমদ ও নুজহাতুল ক্বারী

এক্ষেত্রে সে মুকীম হিসাবে পরিগণিত হবে এবং কসর বাতিল ও রহিত হয়ে যাবে।[৬৬]

মাছআলাঃ (১৬৪)

কসর নামাজের ক্বাজা কখন ও কিভাবে হবে?

প্রকাশ থাকে যে যদি মুসাফির অবস্থায় কোন নামাজ ক্বাজা হয়ে গেলে এ অবস্থায় ঘরে পৌঁছার পর তা আদায় করবে। তখন কসরই পড়তে হবে। অনুরূপ ঘরে থাকা অবস্থায় কোন নামাজ ক্বাজা হয়ে থাকলে আর যদি উক্ত ক্বাজা নামাজ সফর অবস্থায় আদায় করার সুযোগ সুবিধা হয়, তবে এ ক্ষেত্রে পুরো নামাজ আদায় করতে হবে।

মাছআলাঃ (১৬৫)

যেই মুসাফির রাত্রে রোজা রাখার নিয়ত করেছে এবং ফজর হওয়ার পর সফর আরম্ভ করল, এক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করা হারাম। যদি ভঙ্গ করেই ফেলে তবে ক্বাজা দেওয়া ওয়াজিব, কাফ্ফারা দিতে হবে না। এটি হানাফীগণের মত।

মাছআলাঃ (১৬৬)

মুসাফিরের নামাযঃ- যে সকল সময়ে চার রাকাআত ফরয নামায রয়েছে যেমন, যোহর, ইশা, আছর সেখানে দুরাকা'আত পড়তে হয়। সুন্নাত পড়া জরুরী নয়। সময় পেলে পড়বে না পেলে পড়বে না। কিন্তু বিতর, ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব হাদিসে এসেছে। তাই তা পড়া উত্তম। শরীয়তে সে নামায কসর বলা হয়। কসরের নামাযের বিধান ৪ হিজরিতে এসেছে।

মাছআলাঃ (১৬৭)

সফরে মাগরিব ও ফজরের নামায পুরো পড়তে হয় তেমনি সুন্নাত ও নফলে কোন কসর নেই।

---

৬৬. ফিকহে ইসলামী ১৬৩ পৃষ্ঠা

মাছআলাঃ (১৬৮)

যদি কোনো মুসাফির মুকীমের পেছনে নামায পড়ে তখন তাকে পুরো নামায পড়তে হয় ইমামের অনুসরনের কারণে।

মাছআলাঃ (১৬৯)

যদি ইমাম মুসাফির হয় এবং মুক্তাদী মুকীম হয় তখন ইমামকে সালাম ফিরানোর পর কিংবা নামায আরম্ভের পূর্বে এই কথা বলে দিতে হবে যে, আমি মুসাফির তাই তোমরা নামায পূর্ণ কর।[৬৭]

মাছআলাঃ (১৭০)

যদি কেউ নিজ দেশ ত্যাগ করেছে এবং অন্য স্থানে নিজের ঘর বানিয়ে ফেলল এবং সেখানে স্বপরিবারে বসবাস করে তখন তাকে সে এলাকার বাসিন্দা বলা হবে যদি সে নিজ পুরাতন দেশে যায় তখন সে মুসাফির হবে।[৬৮]

মাছআলাঃ (১৭১)

শাদী হওয়ার পর যখন মহিলা শাশুর বাড়িতে থাকে তখন তা তার দেশ হিসাবে গণ্য হবে।

মাছআলাঃ (১৭২)

যদি কারো নামায সফরে কাযা হল, সে যদি ঘরে তা কাযা করে তখন তাকে কসর করতে হবে পুরো পড়তে হবে না, তেমনি কারো নামায ঘরে কাযা হল যদি সে তা সফরে কাযা করে তখন তাকে পুরো পড়তে হবে।[৬৯]

---

[৬৭]. নুরুল ইযাহ, হেদায়া, শামী;৮২১।
[৬৮]. শরহে বেকায়া, ২৩৭।
[৬৯]. মাজমাউল আনহার:১৬৩।

মাছআলাঃ (১৭৩)

যে কর্মচারী সবসময় দূরে থাকে সে কোন স্থানে পনের দিন স্থির ভাবে থাকে না তখন তার জন্য কসর করার অনুমতি রয়েছে।[৭০]

মাছআলাঃ (১৭৪)

যদি কেউ রাস্তা বা কোন মনযিলে তিন চারদিন অবস্থান করে কিন্তু সে তিন চারদিন পরে যাচ্ছে না আবার তিন চার দিন রয়ে গেল এভাবে যদি সে এক নাগাড়ে পনর দিন থাকার দিন নিয়ত না করে তখন সে যতদিন থাকে ততদিন সে মুসাফির হিসাবে গণ্য হবে।

মাছআলাঃ (১৭৫)

কোন এক স্থানে পনর দিন বা তার চেয়ে বেশী দিন থাকার নিয়ত করে তখন সে মুকীম হয়ে যাবে যদি পনর দিনের কম নিয়ত করে তখন কসর করবে।

মাছআলাঃ (১৭৬)

যদি ইমাম মুসাফির হয় এবং মুক্তাদি কিছু মুকীম ও কিছু মুসাফির তখন মুকীম নিজের নামায পূর্ণ করবে এবং মুসাফির ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে।

মাছআলাঃ (১৭৭)

মুসাফির নিজ বাড়িতে ফিরলে নামায পুরো পড়বে।

মাছআলাঃ (১৭৮)

৭০. শামী, ৮২১।

শরীয়তে মুসাফির বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে এমন স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা করে যার দূরত্ব ৪৮ মাইল। যদি তার চেয়ে কম স্থানে সফর করে তখন সে মুসাফির না।[৭১]

মাছআলাঃ (১৭৯)

যদি কেউ ৪৮ মাইলের সফরের ইচ্ছা করার পর নিজ এলাকা থেকে বের হল সে মুসাফির হয়ে যাবে। যদি তার ষ্টেশন তার শহরের ভেতরে হয় তখন তার বিধান তার শহরের আর যদি তা তার শহরের বাইরে হয় তখন সে ষ্টেশন থেকে মুসাফির হবে।[৭২]

মাছআলাঃ (১৮০)

যদি কোন ব্যক্তি বিমানে, রেলে, মোটরে, পানির জাহায দিয়ে সফর করে তখন তারও এই বিধান। তাকে ৪৮ মাইলের চেয়ে বেশী যেতে হবে তখন সে মুসাফির হবে। যদিও সে কয়েক ঘন্টায় পৌঁছে যায়। যদি ততদুর নয় তখন সে মুসাফির হবে না।[৭৩]

মাছআলাঃ (১৮১)

যদি কোন মুসাফির ভুলে চার রাকাত নামায পড়ে যদি সে দ্বিতীয় রাকাতে বসে গেল তখন আবার দ্বিতীয়বার নামায পড়ার দরকার নেই। সে সিজদা সাহু করে নামায শেষ করবে।

মাছআলাঃ (১৮২)

---

[৭১]. ফতওয়ায়ে শামী

[৭২]. ফতওয়ায়ে শামী:২১৯

[৭৩]. ফতওয়ায়ে আলমগিরী, খ,১ পৃ:৮৯।

যদি কেউ সওয়ারী থেকে নেমে নামায পড়ার সুযোগ পায় তখন সে নেমে নামায পড়বে, যদি সে নেমে নামায পড়ার সুযোগ না পায় বা সওয়ারী দাঁড়ায় না যদি দাঁড়ায় তখন সামান্য সময় বা আসবাব চুরি হওয়ার আশংখা রয়েছে বা গাড়ি চলে যাওয়ার আশংখা রয়েছে তখন গাড়িতেই নামায পড়া চাই।

মাছআলাঃ (১৮৩)

যদি কষ্ট ব্যতীত গাড়িতে কোন জায়গা পাওয়া যায় তখন সেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নেবে তা উত্তম যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ সেখানে না হয় তখন বসে বসে নামায পড়বে।[৭৪]

যদি বসে পড়লে সিজদার স্থান পাওয়া না যায় তখন রুকু সিজদা ইশারা করে পড়বে। যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে পড়ে যাওয়ার আশংখা রয়েছে তখন বসে বসে নামায পড়বে। আর যদি ধারণা হয় যে গাড়ী কোন স্থানে দাঁড়াবে যেখানে কাযাবিহীন স্থির ভাবে নামায পড়া যাবে তখন অপেক্ষা করা মুস্তাহাব।[৭৫]

মাছআলাঃ (১৮৪)

মুসাফিরের কসর কখন থেকে বাতিল হিসাবে গণনা হয়? মুসাফির যখন ঘরে ফিরবে বা কোন স্থানে পনের দিন বা তার চেয়ে বেশী থাকার ইচ্ছা করবে তখন সে মুকীম হিসাবে গণ্য হবে এবং কসর বাতিল হয়ে যাবে।[৭৬]

[৭৪]. নুরুল ইযাহ।
[৭৫]. ইসলামী ফিকাহ।
[৭৬]. ইসলামী ফিকাহ, ১৬২

রোযার বর্ণনা

মাছআলাঃ (১৮৫)

রোজা ভঙ্গ করার বৈধ কারণ সমূহ কি? উল্লেখ থাকে যে রোজা ভঙ্গ করার জায়েজ অবস্থা সমূহ হচ্ছে অসুস্থ হওয়া কিংবা অধিক কষ্ট হওয়ার কারণে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ ও বৈধ। যদি এই আশংখা হয় যে রোজা রাখার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ার কিংবা দ্রুত সুস্থ ও আরামবোধ না হওয়া অথবা অধিক কষ্টের কারণ হয়, তবে এক্ষেত্রে তিন ইমাম তথা ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক রাহমাহুমুল্লাহ ঐক্যমত যে, রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ। তবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) ব্যতীত, কেননা তার মতে এমতাবস্থায় রোজা ভঙ্গ করা সুন্নাত এবং রোজা রাখা মাকরূহ। আর যদি ধ্বংস কিংবা বেশী বেশী ক্ষতি হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় ধারণা হয় তবে এক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করা ওয়াজিব এবং রাখা সর্ব সম্মতক্রমে হারাম। সফরের অবস্থায় রোজা বর্জন করা মুবাহ। কমপক্ষে ৭৪/৭৫ কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে সফর হলে কসর ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর উক্ত সফর পদব্রজে হউক কিংবা রেলগাড়ী অথবা উড়োজাহাজ কিংবা অন্যান্য বাহনে হউক। তবে যদি সফরের মধ্যে কষ্ট অনুভব না হয় তাহলে রোজা রাখা উত্তম। আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন- **وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌلَكُمْ** অর্থাৎ যদি মুসাফির অবস্থায় রোজা রাখ তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে।

মাছআলাঃ (১৮৬)

হায়েজ ও নেফাছ অবস্থায় রোজা তরক তথা বর্জন করা ওয়াজিব। রোজা রাখা হারাম। তবে যখনই পাক পবিত্র হয়ে যাবে তখনই সেই মহিলা রোজা আরম্ভ করা আবশ্যক। আর যে সমস্ত রোজা হায়েজ নেফাছ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তা রমজান শরীফের পরে পূরণ করা আবশ্যক।

মাছআলাঃ (১৮৭)

যদি কোন ব্যক্তির ক্ষুধা ও পিপাসা এত তীব্রতা ও বেশী হয় যে এই অবস্থায় রোজা রাখা সাধ্যের বাইরে হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ এবং ক্বাজা ওয়াজিব হবে।

বার্ধক্য কিংবা শক্তিহীনতার কারণে রোজা বর্জন করার হুকুমঃ বার্ধক্য দুর্বল ও শক্তিহীন ব্যক্তি যিনি পুরো বৎসরের কোন সময়ই রোজা রাখতে অক্ষম তার ক্ষেত্রে রোজা তরক (বর্জন) করা জায়েজ। তবে তার উপর ওয়াজিব যে প্রতিদিনের রোজার পরিবর্তে একজন অভাবীকে খানা খাওয়ানো। এই হুকুম সেই অসুস্থ ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য। যার শারীরিক সুস্থতার কোন প্রকার আশা করা যায় না। তাদের বেলায় ফিদিয়া দেওয়ার পর রোজা ক্বাজা করা ওয়াজিব নয়।

মাছআলাঃ (১৮৮)

যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখতে অক্ষম। কিন্তু রমজানের পর অন্য সময়ে রোজা ক্বাজা করার শক্তি রাখে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে সে সময় রোজা ক্বাজা করা। এর জন্য ফিদিয়া নাই।

মাছআলাঃ (১৮৯)

মৃত ব্যক্তির ক্বাজা হওয়া রোজার হুকুম কি? প্রকাশ থাকে যে, যদি মৃত ব্যক্তি ফিদিয়া আদায় করার জন্য অসিয়ত করে থাকে তবে তার ওয়ারিশদের উচিত যে মৃতের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে ফিদিয়া আদায় করা যদি অসিয়ত না করে থাকে এবং ওয়ারিশ বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় তবে তাদের পক্ষ হতে ফিদিয়া আদায় করতে হবে। এর দ্বারা মৃতের পরকালে ফায়েদা হবে এবং ওয়ারিশদের ও ছাওয়াব অর্জিত হবে। তবে না বালেগ তথা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিশদের সম্পদের অংশ হতে ফিদিয়া আদায় যেন না হয়।

মাছআলাঃ (১৯০)

নফল রোজা রাখার পর ভঙ্গ করার হুকুম কি? এর উত্তরে বলা যায় যে নফল রোজা রাখার পর যদি ভঙ্গ করা হয়। সেক্ষেত্রে এর ক্বাজা করা ওয়াজিব। হানাফী ওলামাগণ নফল রোজা ভঙ্গ করা মাকরূহে তাহরীমি এবং এর ক্বাজা করাও মাকরূহে তাহরীমি বলেছেন।

মালেকী মাজহাবের ফকীহবিদগণের মতে যে রোজা কোন ব্যক্তি নফল হিসাবে রেখেছে এবং তার মা বাবার মধ্য হতে কোন একজন কিংবা শাইখ মেহেরবানী ও স্নেহ পরবশ হয়ে রোজা ইফতার করার হুকুম দিলে সেক্ষেত্রে ভঙ্গ করা জায়েজ আছে এবং এর ক্বাজা দিতে হবে না।

মাছআলাঃ (১৯১)

হামেলা অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলা কিংবা দুগ্ধ পোষ্য মহিলার (যে মহিলা শিশুদের দুধ প্রদান করে) যদি এই আশঙ্কা হয় যে রোজা রাখতে গিয়ে তার জান কিংবা বাচ্চা অথবা উভয়ের ক্ষতির আশঙ্কা হয় এ ক্ষেত্রে সেই মহিলা রোজা না রাখা জায়েজ আছে। তবে এ সমস্ত মহিলার উপর পরবর্তীতে রোজা ক্বাজা করা ওয়াজিব। ফিদিয়া ওয়াজিব নয়। আর ক্বাজা রোজা ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন রাখা ওয়াজিব নয়।

নিজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ পানকারী মা কিংবা বেতনধারীনী দুধ পানকারী মহিলা উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি মা হয় তবে তার উপর শরীয়তের দৃষ্টিতে দুধ পান করানো ওয়াজিব। দুধ পান করানো যদি বদলা তথা বেতন নির্ধারণের ভিত্তিতে হয় তবে দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করা ওয়াজিব।

কতক রোজা যা মাকরূহে তানজীহি এর বর্ণনাঃ

يوم عاشورا তথা মহররমের ১০ তারিখের রোজা যার সাথে সাথে ৯ তারিখ কিংবা ১১ তারিখের রোজা মিলানো না হবে, তবে তা মাকরূহে তানজীহি। অর্থাৎ শুধুমাত্র ১০ই মুহররম দিবসে একটি রোজা রাখা।

অনুরূপ নববর্ষের রোজা এবং উৎসব মুখর দিবসের রোজা রাখা, তবে শর্ত হচ্ছে এটি সেদিন না হয় যেই দিন সে ব্যক্তি আগে থেকেই রোজা রেখে আসতেছে। দায়েমী রোজা তথা সর্বদা রোজা রাখা যার দরূন শরীরে দুর্বলতা লাহিক তথা অনুভব হয়।

صوم وصال তথা সর্বদা রাত দিন খানা-পিনা ইত্যাদি হতে নিজেকে বিরত রাখাও মাকরূহ। মুসাফির অবস্থায় রোজা রাখা, যখন রোজা রাখা তার কষ্ট ও কঠিন হবে, সেক্ষেত্রে ও রোজা রাখা মাকরূহ।

হুজুর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বেলাদত দিবসের রোজা, কেননা এটি ঈদের সদৃশ্য এ জন্য উক্ত দিবসে রোজা রাখাও মাকরূহ।

অসুস্থ ও মুসাফিরের ন্যায় যদি গর্ভবতী মহিলা দুধ পানকারী মহিলা এবং বার্ধক্য জনিত পুরুষ মহিলা যারা রোজা রাখা কষ্টকর হবে কিংবা মারাত্মকভাবে শারীরিক দুর্বলতার আশঙ্কা তারাও রোজা রাখা মাকরূহ। অনুরূপ কোন ফরজ রোজার ক্বাজা ওয়াজিব হওয়া অবস্থায় তা আদায় না করে নফল রোজা রাখা মাকরূহ। কেননা ফরজ রোজা আদায় করা নফলের চেয়ে আবশ্যকতা বেশী।

মাছআলাঃ (১৯২)

নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে দেওয়ার বিধানঃ নফল রোযা রাখার পর যদি ভেঙ্গে দেয় তখন তার কাযা রাখা ওয়াজিব। ওলামায়ে আহনাফ নফল রোযা ভেঙ্গে দেওয়াকে মাকরূহে তাহরীমি বলেন। তার কাযা রাখাও মাকরূহে তাহরিমী।

ফুকাহায়ে মালেকীদের নিকট ঐ নফল রোযা যা নফল হিসাবে রেখেছে তার মাতাপিতা বা শায়খ রোযা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল তখন ভেঙ্গে দেওয়া বৈধ। তার কাযা নেই।

মাছআলাঃ (১৯৩)

গর্ভবতী বা দুধপানকারিণী মহিলার যদি আশঙ্কা হয় রোযা রাখলে নিজের জানের বা বাচ্চার বা উভয়ের ক্ষতির আশংখা রয়েছে তখন তার জন্য রোযা ছেড়ে দেওয়া বৈধ এরকম মহিলাদের উপর সামর্থ হলে কাযা ওয়াজিব ফিদিয়া দিলে হবে না এবং কাযা লাগাতারও রাখতে হবে না।

দুধপানকারিণী মহিলা বা মজুরী নিয়ে দুধপানকারিণী মহিলা উভয়ের একই হুকুম। যদি মা হয় তখন তার উপর শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব আর যদি মজুরী নিয়ে দুধ পান করানো হয় তখন মুসাহেরার দিক দিয়ে দুধ পান করানো ওয়াজিব হয়ে পড়ে।

কিছু রোযা রাখা মাকরূহে তানযিহী:

১. আশুরার রোযা একা রাখা, নয় বা এগার তারিখ ব্যতীত।

২. নববর্ষ ও মেহেরজান তথা উৎসব মূখর রোযা রাখা যদি তা তার অভ্যাসের তারিখে না পড়ে।

৩. অনবরত রোযা রাখা। যার কারণে দূর্বলতা এসে যায়।

৪. সওমে বেছাল তথা রাত-দিন ইফতার না করে রোযা রাখা।

৫. মুসাফির রোযা রাখা যদি রোযা তার উপর কঠিন ও কষ্টদায়ক হয়।

৬. রাসূলের জন্মের দিন ঈদের সাদৃশ্য তাই সেদিন রোযা রাখা মাকরূহ।

৭. রোগী ও মুসাফিরের মত যদি গর্ভবতী মহিলা ও দুধপানকারিণী মহিলা ও বয়স্ক পুরুষ-মহিলা যাদের রোযা রাখা কষ্ট বা ক্ষতির আশংখা রয়েছে তাদেরও রোযা রাখা মাকরূহ।

৮. কোন ফরয রোযার কাযা থাকা সত্ত্বেও নফল রোযা রাখা মাকরূহ কেননা নফলের চেয়ে ফরযের কাযা করা উত্তম।

মাছআলা: (১৯৪)

রোযা ছেড়ে দেওয়ার বৈধ পদ্ধতি: ১. রোগ ২. অধিক কষ্টের কারণে রোযা ভেঙ্গে দেওয়া বৈধ। যদি কেউ আশংখা করে যে, রোযা রাখলে রোগ বেড়ে

যাবে বা দেরিতে রোগ নিরাময় হবে বা কঠিন কষ্ট ভোগ করবে তখন এসকল পদ্ধতিতে ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (রহ:) একমত যে, তাদের জন্য না রাখা বৈধ। ইমাম আহমদের নিকট রোযা না রাখা সুন্নাত, রাখা মাকরূহ। আর যদি রোগ বাড়ার ও কষ্ট নিশ্চিত হয় তখন রোযা না রাখা ওয়াজিব। রাখা হারাম।

সফরের অবস্থায় রোযা ছেড়ে দেওয়া মুবাহ। যদি সফর এত বেশী দূরে হয় যেখানে কসর ওয়াজিব বা ৭৪/৭৫ কিলোমিটার সফর হয় তা হেঁটে হোক বা গাড়িতে হোক তখনও রোযা ছেড়ে দেওয়া বৈধ। হ্যাঁ যদি সফরে কোন কষ্ট না হয় তখন রোযা রাখা উত্তম। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ

অর্থ: যদি তোমরা সফরে রোযা রাখ তা উত্তম।

মাছআলা: (১৯৫)

যে মুসাফির রাত থেকে রোযার নিয়ত করেছে সে ফজর উদয় হওয়ার পর সফর শুরু করেছে তখন তার জন্য রোযা ভেঙ্গে দেওয়া বৈধ। যদি ভেঙ্গে দেয় তখন কাযা ওয়াযিব আহনাফের মতে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

মাছআলা: (১৯৬)

হায়েয ও নেফাসের সময় রোযা ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিব। রোযা রাখা হারাম। কিন্তু সে যখন পবিত্র হয়ে যাবে তখন রোযা রাখা শুরু করে দিতে হবে এবং যে সকল রোযা বাদ গেল তা রমযানের পরে কাযা করে দেবে।

মাছআলা: (১৯৭)

যদি কারো অধিক পিপাসা বা ক্ষুধা লেগেছে তখন রোযা বরদাশত করা কঠিন হয়ে গেল তখন রোযা ভেঙ্গে দেওয়া বৈধ এবং তার কাযা করা ওয়াজিব।

বয়স বেশী হওয়ার কারণে রোযা ছেড়ে দেওয়ার বিধান। যে ব্যক্তি বয়সের কারণে রোযা রাখতে অক্ষম তখন তার জন্য রোযা ছেড়ে দেওয়া বৈধ। কিন্তু

তার উপর প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন গরীবকে দু'বেলা খাবার দিতে হবে। একই হুকুম ঐ রোগীর যে সুস্থ হওয়ার আশা রাখে না ফিদিয়া দেওয়ার পরে তাকে আর কাযা করতে হবে না।

মাছআলাঃ (১৯৮)

যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখার সামর্থ না রাখে তবে সে অন্য সময়ে কাযা করতে পারবে তখন তার উপর কাযা করা ওয়াযিব ফিদিয়া দেওয়া বৈধ হবে না।

মাছআলাঃ (১৯৯)

মৃতের কাযা রোযার কি হুকুম?

যদি মৃত ফিদিয়া দেওয়ার অসীয়ত করে তখন তার উত্তরাধিকারের উচিত তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে ফিদিয়া আদায় করবে যদি সে অসীয়ত না করে এবং উত্তরাধিকার বালেগ থাকে তখন তারা ফিদিয়া আদায় করতে পারবে। তা দ্বারা তার পরকালে ফায়দা হবে তবে নাবালেগ উত্তরাধিকারের অংশ থেকে ফিদিয়া আদায় সহীহ হবে না।[৭৭]

ফিদিয়ার বর্ণনা

মাছআলাঃ (২০০)

ফিদিয়া এর পরিমাণ এবং কোন জিনিস দ্বারা ফিদিয়া দেয়া যাবে?

উল্লেখ্য যে ফিদিয়া এর পরিমাণ হচ্ছে একজন অভাবীকে এই পরিমাণ শস্য ফসল দিবে যে পরিমাণ ছদকায়ে ফিতরায় দেয়া হয়। অর্থাৎ পৌনে ২ সের গম অথবা সাড়ে ৩ সের যব। কিংবা এর মধ্য হতে যে কোন একটির মূল্য। যদি গম এবং যব ব্যতিত অন্য কোন শস্য ফিদিয়া দেয়া হয় সেক্ষেত্রে পৌনে ২ সের গম কিংবা সাড়ে ৩ সের যবের যে মূল্য হয় সে মূল্য সমপরিমাণ অন্য কোন শস্য দেয়া যাবে।

[৭৭] . ইসলামী ফিকাহ

ফিদিয়ার মধ্যে যদি শস্য না দিয়ে বরং একজন অভাবীকে দুই বেলার খাবার পেট ভর্তি তথা আসুদা করে খাওয়ায়ে দিলে এর দ্বারাও ফিদিয়া আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে সে খাবার দিতে হবে যা নিজে খেয়ে থাকে।

মাছআলাঃ (২০১)

ফিদিয়া শস্য কিংবা শস্যের মূল্য কয়েকজন অভাবীকেও দেওয়া জায়েজ আছে।

মাছআলাঃ (২০২)

ফিদিয়ার পরিমাণঃ ফিদিয়ার পরিমাণ হল একজন অভাবী ব্যক্তিকে এত পরিমাণ খাবার দিবে যত পরিমাণ সদকায়ে ফিতর দেওয়া হয়। অর্থাৎ, পৌনে দু'সের গম বা সাড়ে তিন সের যব বা খেজুর বা তার মূল্য। যদি গম এবং যব ছাড়া অন্য কোনো ফসল দিতে চায় তখন পৌনে দু'সের গমের মূল্য বা সাড়ে তিন সের যবের মূল্য হিসাবে আদায় করবে।

যদি ফিদিয়াতে দু'বেলা খাবার আহার করায় তখনও ফিদিয়া আদায় হবে। তবে সে যা খায় তা দিতে হবে।

মাছআলাঃ (২০৩)

একটি রোজার ফিদিয়া কয়েকজনকে দেওয়া বৈধ।

রাসূল ﷺ'র প্রস্রাব মোবারকের হুকুম

মাছআলাঃ (২০৪)

পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, একজন ছাহাবী সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্রাব মোবারক পান করেছিল, এতে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, তার পেটে ব্যাথা-বেদনা হবেনা। এ ঘটনাটি "মাদারেজুন্নবুয়্যাত" শরীফে বর্ণিত রয়েছে। এ ঘটনাটি সঠিক ও বিশুদ্ধ। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হচ্ছে যে- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্ছিষ্ট বিষ্ঠা ও

প্রস্রাব মোবারক পাক ও পবিত্র, এর অস্বীকারকারী অজ্ঞতারই পরিচায়ক, কেননা বর্তমান জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু লোকদের নিকট এহেন অসাধারণ ও দুর্লভ মাছআলার জ্ঞান না থাকার কারণে এটিকে অস্বীকার করছে। হাদিস শরীফের ইনকার ও অস্বীকার করা পাপ ও ফিস্ক। এ ঘটনার অস্বীকার কারীকে তওবা করা আবশ্যক।[৭৮]

জারজ সন্তানের যবেহ'র হুকুম

মাছআলাঃ (২০৫)

জারজ সন্তান যখন মুসলমান জ্ঞানী (আকল সম্পন্ন) নামাজ, রোজা ইত্যাদির পাবন্দী (আদায়কারী) হবে। তার জবেহকৃত পশু মাকরূহ ব্যতীরেকে জায়েজ।[৭৯]

খতম তারাবীর দোয়ার বর্ণনা

মাছআলাঃ (২০৬)

ويكره الدعاء عند ختم القرآن فى شهر رمضان وعند ختم القرآن بجماعة

রমজান শরীফে খতমে কোরআনের সময় জামাতের সাথে দোয়া করা মাকরূহ। অর্থাৎ উচ্চস্বরে দোয়া করার জন্য লোকদের ডাকা মাকরূহ। কেননা এটি হুজুর আলাইহিস্সালাম এবং ছাহাবায়ে কেরাম হতে প্রমাণিত নাই। আর এতে অহংকার ও গৌরবের আশংকা থাকতে পারে। তবে বর্তমানে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফকীহগণ তা জায়েজ বলেছেন। যদি তাতে আত্মগৌরবের আশংকা না থাকে।

মাছআলাঃ (২০৭)

---

[৭৮]. খায়রুল ফতোয়া, ৩২৯ পৃষ্ঠা

[৭৯]. ফতোয়ায়ে নুরীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭৬

কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের প্রাক্কালে **اعوذبالله** পাঠ করে সাথে **بسم الله** পাঠ করা উত্তম।

من قرأة سورة او قرأة آية فعليه ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, ويتبع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ -

কিবলার বর্ণনা

মাছআলাঃ (২০৮)

কিবলার দিকে ইচ্ছাকৃত ভাবে পা বিস্তৃত করা (টানা) মাকরুহ।

ويكره مد الرجلين الى القبلة فى النوم وغيره عمدًا

কিবলার দিকে পা বিস্তৃত করা, ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা নিদ্রায় হোক অথবা জাগ্রত অবস্থায় মাকরুহ।

ছবির বর্ণনা

মাছআলাঃ (২০৯)

যদি নামাজীর মাথার উপরে কিংবা ছাদের উপর ছবি (তাছ্বীর) ঝুলানো হয় অথবা নামাজীর আগে কিংবা নামাজীর ডানে-বামে অথবা সিজদার স্থানে ছবি থাকে, এ সমস্ত অবস্থায় নামাজ মাকরূহে তাহরীমি হবে। তেমনি স্থানে যদি কেউ নামাজ আদায় করে থাকে তবে সেক্ষেত্রে অন্য স্থানে গিয়ে দ্বিতীয়বার নামাজ আদায় করা আবশ্য হবে। যেখানে সে বস্তু না থাকবে যার দ্বারা নামাজ মাকরূহ হয়। নামাজীর পিছনে যদি ছবি হয় সেক্ষেত্রেও মাকরূহ হতে খালি নয়। তবে তা হবে সূক্ষ্ম ও হালকা মাকরূহ। অতএব নামাজ এরকম রুমে বা কামরায় আদায় করতে হবে যাতে নামাজীর সামনে, ডানে, বামে, উপরে এবং সিজদার স্থানে কোন প্রাণীর ছবি না হয়।

জ্ঞাতব্য যে, ছবি ছাপানো হউক কিংবা হাত দ্বারা অঙ্কিত হউক ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য। অর্থাৎ মাকরূহে তাহরীমি হবে। আর প্রাণহীন কোন ছবি কিংবা ফটো থাকলে নামাজ মাকরূহ সৃষ্টি করবে না। যেমন- স্থান, বিল্ডিং, দালান, মসজিদ, মাদ্‌রাসা, গাছ, জমিন, আসমান ও বাগান ইত্যাদির ফটো।

তেমনিভাবে ছবিযুক্ত টাকা, নোট, পয়সা, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র যদি নামাজির পকেটে অথবা ব্যাগের মধ্যে লুকায়িত বা গোপনীয় ভাবে হয়, সে সব ক্ষেত্রে নামাজের মধ্যে মাকরূহ (কারাহাত) সৃষ্টি হবে না।[৮০]

জানাযার নামাযের বর্ণনা

মাছআলাঃ (২১০)

জানাযার নামাজে কমপক্ষে তিন কাতার করা উত্তম। হাদিস শরীফের মধ্যে রয়েছে- যার নামাজ তিন কাতারে আদায় করা হয়, তার যাবতীয় গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

মাছআলাঃ (২১১)

যার জানাজার নামাজে কেবলমাত্র সাতজন লোক হয়, তাহলে তিন কাতার কিভাবে করবে?

এ ক্ষেত্রে একজন ইমাম হবে, অতঃপর তিনজন প্রথম কাতারে, দু'জন দ্বিতীয় কাতারে আর একজন তৃতীয় কাতারে দাঁড়াবে।

মাছআলাঃ (২১২)

জানাযার মধ্যে পিছনের কাতার অন্যান্য কাতার হতে ফজিলতময়।[৮১]

মাছআলাঃ (২১৩)

যদি জানাযার নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, এমতাবস্থায় অজু ও গোসল করে জানাযায় শরীক হতে গেলে ততক্ষণে নামাজ শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে তখন তায়াম্মুম করে জানাযার নামাজে শরীক হয়ে যাবে।

মাছআলাঃ (২১৪)

---

[৮০]. আলমগীরি, দুররে মোখতার, ফতোয়ায়ে বরকাতুল উলুম ইত্যাদি

[৮১]. দুররে মোখতার

যদি পায়ে জুতা থাকে আর উক্ত জুতা পাক-পবিত্র হয়, কোন প্রকার নাপাকী না লাগে সেক্ষেত্রে জুতা খোলার প্রয়োজন নাই। আর যদি নাপাকী লাগে তাহলে জুতা খোলে আলাদা রেখে দিবে, তারপর নামাযের জন্য নিয়্যত করবে।

মাছআলাঃ (২১৫)

জানাযার নামাজ ফরজে কেফায়া। জানাযার নামাজের মূল হচ্ছে দোয়া। চার তাকবীরের সাথে ইমামের ইকতেদা করে নিয়্যত করবে যে- আমি ইকতেদা করছি এই ইমামের অথবা অন্তরে এভাবে নিয়্যত করবে যে- ইমামে যে নিয়্যত করেছে, আমিও অনুরূপ ইমামের পিছনে একই নিয়্যত করছি আল্লাহু আকবর (আলমগীরি)। আল্লাহু আকবর বলে উভয় হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করে হাত বাঁধবে, অতঃপর নিম্নস্বরে ছানা পাঠ করবে। ছানা হচ্ছে–

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

অতঃপর দ্বিতীয় তাকবীর হাত উঠানো ব্যতীত আল্লাহু আকবর বলে চুপে চুপে নিম্নের দরূদে ইব্রাহীমি দু'টি পাঠ করবে।

(১) اَللهم صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌمَجِيْدٌ .

(২) اَللهم بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

এরপর তৃতীয় তাকবীর হাত উত্তোলন ব্যতীত আল্লাহু আকবর বলে নিম্নস্বরে বালেগ-বালেগা, মহিলা-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে এই দোয়াটি পাঠ করবে–

اَللهم اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا- اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ .

পাঠ শেষে তাকবীর বলে উভয় দিকে সালাম ফেরাবে।

মাছআলাঃ (২১৬)

আর যদি নাবালেগ ছেলে-মেয়ে হয় তবে সেক্ষেত্রে উপরোক্ত দোয়ার স্থলে-

اَللهم اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

আর মেয়ের ক্ষেত্রে **شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا** এর স্থলে **اَجْعَلْهَا** আর **شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً** এর স্থলে **اَجْعَلْهُ** পাঠ করবে। চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে।

মাছআলাঃ (২১৭)

যে সমস্ত লোকের ছানা ও দরূদে ইব্রাহীম জানা না থাকে, কিংবা মুখস্থ করতে কষ্ট হয় তাদের ক্ষেত্রে ছানার মধ্যে **اَلْحَمْدُلِلهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا** আর দরূদের স্থলে **اَللهم اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مُبَارَكًا** এবং নাবালেগ ছেলের ক্ষেত্রে **اَللهم اعذهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ** এবং নাবালেগ মেয়ের ক্ষেত্রে **اَللهم اعذهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ** পাঠ করে নেয়াই যথেষ্ট। চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে।

মাছআলাঃ (২১৮)

যদি এমন কোন দুর্ভাগা ও বদকিসমতের লোক হয়; যার নিকট জানাযার নামাজের ছোট-বড় কোন দোয়াই জানা নাই আর নামাজের পাবন্দী না হওয়ার কারণে ছানা ও দরূদে ইব্রাহীমিও তার জানা নাই। এ ক্ষেত্রে আপরাগ পক্ষে অন্তরে নামাজের নিয়ত করে চার তাকবীর এভাবে বলা আবশ্যক অর্থাৎ প্রথম তাকবীরে উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবর বলে নামাজের ন্যায় নাভির উপরে হাত বাঁধবে, অতঃপর বাকী তিন তাকবীরে হাত উঠা ব্যতীত কেবল মুখে আল্লাহু আকবর বলবে এবং চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফেরাবে। উল্লেখ্য যে, ছোট-বড় কোন দোয়া না জানা (অজানা) ব্যক্তিদের বেলায় চারটি তাকবীরই নামাজের স্থলাভিষিক্ত।

মাছআলাঃ (২১৯)

জানাযার নামাজে ইমাম মুক্তাদী উভয়ের ক্ষেত্রে তাকবীর ও দোয়া পাঠ করা আবশ্যক। কেবল পার্থক্য হচ্ছে এতটুকু যে, ইমাম জোর আওয়াজে তাকবীর বলবে আর মুক্তাদী আস্তে (নিম্ন স্বরে) বলবে।

মাছআলাঃ (২২০)

যে মুক্তাদী ছানা, দরূদ ও দোয়া পাঠ করতে পারে না সে কেবল তাকবীর বলে নেওয়া চাই।

মাছআলাঃ (২২১)

দোয়া চুপে চুপে করা সুন্নাত। **لان السنة فى الادعية الخفية** আর **رفع الصوت** দ্বারা উদ্দেশ্য এটিও হতে পারে-

منه كان عليه اهل الجاهلية من الافراط من مدح الميت عند جنارته حتى كانوا يذكرون ماهو سببه المحال -

অর্থাৎ জাহেলীয়াতের যুগে লোকগণ মৃতের তারীফ জানাজার নামাজের সময় অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণনা করত যা মৃতের মধ্যে থাকাটা একেবারেই অসম্ভব। যেমনটি আমাদের বর্তমান সময়ে কোন কোন এলাকায় দেখা যায় ও শুনা যায় যে এমনভাবে অতিরঞ্জিত ও বাড়িয়ে মৃতের তারিফ প্রশংসা করা হয়ে থাকে যা কিনা ধ্যান ধারণার বাইরে, উক্ত গুণ মৃতের মধ্যে থাকাটা কোন অবস্থায়ই সম্ভবপর নয়। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এদের থেকে হেফাজত রাখুন। আমিন।

মৃতকে গোসল দেয়ার বর্ণনা

মাছআলাঃ (২২২)

মৃতকে গোসল দেওয়ার জন্য তিন প্রকারের পানি হতে পারে। (১) সাধারণ হালকা গরম পানি। (২) কুল পাতার পাকানো হালকা গরম পানি। (৩) কাপুর মিশ্রিত হালকা গরম পানি। এ সমস্ত পানি ধৌত করার জন্য। আর যদি কুল পাতার ও কাপুর মিশ্রিত গরম পানি পাওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রে

সাধারণ হালকা গরম পানিই যথেষ্ট। তবে অতিরিক্ত গরম পানি যেন না হয়।

যে স্থানে মৃতকে ধৌত করার জন্য ইচ্ছা হয় ঐ স্থানে এমনভাবে একটি লম্বা গর্ত খনন করে নিবে, যেখানে গোসলের পানি জমা হবে, এদিক সেদিক কোন কিছু যেন ফেলতে না হয়। অতঃপর উক্ত গর্তের উপর একটি তক্তা কেবলার দিক করে বিছিয়ে দিবে, গর্ত খনন এমন ভাবে করবে যে, মৃতের পা কেবলার দিকে হবে। তক্তা বিছিয়ে দেয়ার পর লোবান, আগরবাতি কিংবা সুগন্ধযুক্ত কোন কিছু তিনবার কিংবা পাঁচবার চতুর্দিকে ঘুরাবে, তার পর মৃতকে **بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ** এই দোয়াটি পাঠ করে উক্ত তক্তার উপর শোয়ায়ে দিবে, তার পা কেবলার দিকে হবে যাতে মৃতের চেহেরা কেবলামুখী হয়।

উল্লেখ্য যে আমাদের দেশে গর্ত খনন ও তক্তা বিছানোর ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে মৃতকে গোসল দেওয়ার জন্য গর্তটি উত্তর দক্ষিণ লম্বা করে খনন করা হয় এবং তক্তাও উত্তর দক্ষিণ লম্বা করে বসানো হয়, মৃতের পা থাকে দক্ষিণে আর মাথা থাকে উত্তরে, যেমনিভাবে আমাদের দেশে কবরস্থ করা হয়। এভাবে মৃতকে গোসল দেওয়ার জন্য উত্তর দক্ষিণ লম্বা গর্ত করা যাবে।

মৃতকে তক্তার উপর শোয়ানোর পর তার পরিধেয় কাপড় খুলে নিয়ে নাভি হতে রান তথা উরু পর্যন্ত অন্য কাপড় দিয়ে ঢেকে দিবে যাতে শরীর ঢাকা থাকে। অতঃপর গোসলের নিয়ত করবে। হাতে কাপড় পেছিয়ে ঐ হাতে মাটির তিনটি ঢিলা দ্বারা প্রথমে মৃতের পায়খানার রাস্তা পরিস্কার করবে এরপর প্রস্রাবের রাস্তা পরিস্কার করবে। অতঃপর কাপড়ের ভিতরে পানি দ্বারা পরিস্কার করবে। এরপর এই নিয়মে অজু করাবে যে, প্রথমে কোন কাপড় কিংবা রূই পানিতে ভিজিয়ে দাঁত ও ওষ্ঠ এবং নাকের উভয় ছিদ্র মুছে দিবে। অতঃপর নাক ও মুখ এবং উভয় কানের মধ্যে রূই দিয়ে দিবে, যাতে করে অজু করানোর সময় এবং গোসল দেওয়ার সময় ভিতরে পানি না

ঢুকে। এরপর প্রথমে মুখ তারপর উভয় হাত কনু পর্যন্ত ধৌত করাবে এটিই হচ্ছে মৃতের অজু।

মাছআলাঃ (২২৩)

মৃতকে গোসল করানোর নিয়মঃ

মৃতকে অজু করানোর পর বাম পার্শ্ব তথা বাম কাধ করে শোয়াবে যাতে করে ডান পার্শ্ব উপরে থাকে অতঃপর কুল পাতা দ্বারা পাকানো হালকা গরম পানি তিনবার মাথা হতে পা পর্যন্ত ঢালবে, এরপর ডান পার্শ্ব করে শোয়াবে যাতে করে বাম পার্শ্ব উপরে থাকে অনুরূপ তিন বার মাথা হতে পা পর্যন্ত পানি ঢালবে যাতে করে পানি নিচে পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এরপর মৃতকে হেলান দিয়ে বসাবে এবং তার পেটে হালকা ভাবে আস্তে আস্তে নিচের দিকে মালিশ করবে, যদি কোন কিছু বের হয় তবে তা মুছে পরিষ্কার করে পানি দ্বারা ধৌত করে দিবে।

মৃতকে অজু গোসল দ্বিতীয়বার দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র মৃতকে বাম পার্শ্ব শোয়াবে অবশিষ্ট যে পানি থাকে তা তিনবার ঢেলে দিবে এবং মৃতের শরীর কাপড় দিয়ে মুছে নাভি হতে উরু পর্যন্ত অন্য কাপড় দ্বারা ঢেকে দিয়ে মৃতকে উঠিয়ে নিবে।

মাছআলাঃ (২২৪)

গোসল দানকারী ব্যক্তি মৃতের ঘনিষ্ট আত্মীয় হওয়া এবং গোসলের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া উত্তম। আর না হয় অন্য কোন ব্যক্তি যিনি গোসলের নিয়ম কানুন সম্পর্কে অভিজ্ঞ সেই গোসল দেয়াবে।

মাছআলাঃ (২২৫)

আর যদি মৃত ব্যক্তিটি পুরুষ হয়, তবে সেক্ষেত্রে গোসল দানকারী কোন পুরুষ না থাকে তাহলে যে মহিলা মুহরেম নয় সেই রকম অমুহরেম মহিলা তার হাতে কাপড় পেছিয়ে তায়াম্মুম করাবে।

মাছআলাঃ (২২৬)

মৃতকে তায়াম্মুম করার নিয়ম হচ্ছে; প্রথমে নিয়ত করবে যে, আমি নিয়ত করছি এই মৃতকে তায়াম্মুম করানোর জন্য **امتثال الامر الله وطهارة للبدن لاستباحة الصلوة ورفع الحدث** বলে উভয় হাত পবিত্র মাটির উপর মেরে প্রথমে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে মাটি যুক্ত হাত দ্বারা মৃতের মুখমন্ডল মাসেহ করবে, ওজুর মধ্যে যে পরিমাণ ধোয়া হয় সে পরিমাণ মাসেহ করবে। অত:পর মাটির উপর হাত মেরে উভয় হাতের কনু থেকে আঙ্গুল পর্যন্ত মাসেহ করে আঙ্গুল হেলাল করবে।

মাছআলা: (২২৭)

জানাযার মধ্যে **رفع الصوت** তথা উচ্চস্বরে কথা বলা মাকরুহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে– চিল্লিয়ে কান্না করা, মাতামতারী করা, পাগলামী করা কিংবা কাপড় চিড়ে ফেলা এ সমস্ত কিছু মাকরুহ। জিকির করা, কালেমা পাঠ করা নিষেধ নয়। বরং এটি ছাওয়াব ও পূণ্যের কাজ। যেমন হযরত হাসান বসরী রাদ্বি আল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত রয়েছে–

ذكر قرأة القرآن لاتنا فى بينهما -

জিকির এবং কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মধ্যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নাই।

মাছআলা: (২২৮)

মৃত ব্যক্তিকে তার স্ত্রী গোসল দিতে পারবে।

কবর যেয়ারতের বর্ণনা

মাছআলা: (২২৯)

তোহফায়ে বুর্‌রার মধ্যে রয়েছে যে, কোন কোন বর্ণনায় জুমার নামাজের পূর্বে কবর জেয়ারত করা নিষেধ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, মূলত: ইহা একটি ভিত্তিহীন কথা যা হারামাইনের পরিপন্থী একটি কাজ। এ ধরনের বর্ণনা দ্বারা

আহলে হারামাইনের বর্ণনাকে রহিত করার অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ জুমার নামাজের পূর্বে কবর জেয়ারত হারামাইনদের কর্ম যা জায়েজ ও বৈধ।[৮২]

মাছআলা: (২৩০)

কবরের পাশে কোরআন শরীফ পাঠ করা মাকরুহ নয়।

قال الصدر الشهيد رحمة الله عليه ومشائخنا اخذوا بقول محمد لاتكره -

ইমাম ছদরুশ শহীদ (রা:) বলেন– আমাদের হানাফী ইমামগণের মতে কবরসমূহের পাশে পবিত্র কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা মাকরুহ নয়।

ইমাম আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম বলেন- কবরের পাশে সূরায়ে মুলূক শরীফ পাঠ করা, উচ্চ আওয়াজে হোক কিংবা চুপে চুপে হোক উভয় অবস্থায় জায়েজ।

মাছআলা: (২৩১)

ইমাম আবু বকর ইবনে আবী সাঈদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি হতে বর্ণিত, তিনি বলেন কবর জিয়ারতের সময় সূরায়ে ইখলাস পাঠ করা মুস্তাহাব।

কবর জিয়ারতের পদ্ধতি দুটি:

(১) সূরায়ে বাকারার প্রারম্ভে **الم .... مفلحون** পর্যন্ত এবং সূরায়ে বাকারার শেষে **آمن الرسول ... كافرين** পর্যন্ত পাঠ করা, তাছাড়া সূরায়ে তাকাসুর সূরায়ে কাফেরুন ও সূরায়ে ইখলাস প্রত্যেকটি সূরা তিন বার করে পাঠ করা।

(২) সূরায়ে ইখলাস ৭ বার পাঠ করা। যে ব্যক্তি ৭ বার সূরায়ে ইখলাস পাঠ করবে যদি সে কবরবাসী গুনাহগার হয় তাহলে তার গুনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন। আর যদি কবরবাসী নেককার হয় তবে পাঠকারীর গুনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন।

---

৮২. ফতোয়ায়ে মাজ্‌মায়ুল বারকাত, তাফসীরে সূরায়ে আলাম নাশরাহ, কৃত-আল- ামা নক্বী আলী খান সাহেব পৃষ্ঠা-২১৪

يستجب عند زيارة القبور قرأة سورة الاخلاص سبع مرات فانّه بلغنى انّه من قرأها سبع مرّات ان كان ذلك غير مغفورله يغفرله وان كان مغفورًا له غفر لهذا لقارى -

তায়াম্মুমের বর্ণনা

মাছআলাঃ (২৩২)

তায়াম্মুমের মধ্যে ফরজ তিনটি। যথাঃ (১) নিয়্যত করা। (২) উভয় হাত পাক মাটির উপর মেরে মুখের উপর মছেহ করা। (৩) উভয় হাত পাক মাটির উপর মেরে উভয় হাত কনুহ পর্যন্ত মাছেহ করা।

মাছআলাঃ (২৩৩)

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ২টি। যথা (১) যে সমস্ত কারণে অজু ভঙ্গ হয়। (২) পানি পাওয়ার পর উক্ত পানি ব্যবহারের উপর সামর্থ থাকলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

মোজার উপর মাসেহ করার বর্ণনা

মাছআলাঃ (২৩৪)

মোজার উপর মাসেহ করা সেই ব্যক্তির বেলায় জায়েজ হবে যিনি পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করে মোজা পরিধান করেছে। যদি এরপর অজু ভঙ্গ হয় তবে সেক্ষেত্রে অজু করে মোজার উপর মাসেহ করবে। মোজার উপর মাসেহ করার ফরজ নিয়ম হচ্ছে হাতের তিন আঙ্গুল দ্বারা পায়ের মাথা হতে তিন সরলরেখা বরাবর গিড়ালির দিকে মাসেহ করা।

মাছআলাঃ (২৩৫)

মোজার উপর মাসেহ করার সময় সীমা হচ্ছে মুকিমদের জন্য একদিন একরাত আর মুসাফিরদের জন্য তিনদিন তিন রাত। আর যার পায়ের তিন আঙ্গুল পরিমাণ চেড়া (ফাটা) থাকে তবে সেক্ষেত্রে মাসেহ করা জায়েজ নাই।

মাছআলাঃ (২৩৬)

মোজার উপর মাসেহ ভঙ্গ হওয়ার কারণ ৪টি। যথাঃ (১) সে সমস্ত বস্তু যার দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়। (২) মাসেহের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়া। (৩) এক পা মোজা হতে বের হওয়া (৪) উভয় পায়ের অধিকাংশ অংশ গিড়ালি পর্যন্ত হয়ে যাওয়া।

খাদেম নিযুক্তের বর্ণনা

মাছআলাঃ (২৩৭)

غزوات তথা যুদ্ধের মধ্যে খেদমতের জন্য ছেলেদেরকে নিয়ে যাওয়া জায়েজ। হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) এরশাদ করেছেন-**من غزا بصبى للخدمة**

মাছআলাঃ (২৩৮)

অলী তথা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিত নাবালেগ ছেলেদের দ্বারা খেদমত গ্রহণ করা জায়েজ নাই।[৮৩]

মাছআলাঃ (২৩৯)

খায়বরের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদেম নির্ধারণ করার লক্ষে হযরত আবু তালহা (রাঃ)কে এরশাদ করেছিলেন যে, এমন কোন ছেলে আছে যেই যুদ্ধের মধ্যে আমার খেদমত করবে, তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) এ সফরের মধ্যে হযরত আনাছ (রাঃ)কে রাসূলের খেদমতের জন্য নিয়োজিত করে দিলেন।

মাছআলাঃ (২৪০)

ছোট বাচ্চা (শিশু) এবং এয়াতিমদের দ্বারা পারিশ্রমিক ব্যতীত খেদমত গ্রহণ করা জায়েজ। কেননা হযরত আনাস (রাঃ) বাচ্চা (শিশু) ও এয়াতিম ছিলেন। তার পিতা মালেক মৃত্যু বরনের পর তার মাতা উম্মে সুলাইমের

৮৩. তাফহীমুল বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা

সাথে আবু তালহার শাদী হয়েছিল এবং তিনি কোন প্রকার পারিশ্রমিকের শর্ত ব্যতীত হযরত সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করেছিলেন। অতএব যদি এয়াতিম বাচ্চার মাতা কিংবা অভিভাবকগণ তাকে খেদমত করার অনুমতি প্রদান করে তবে জায়েজ হবে।[৮৪]

মাথা মুন্ডানোর বর্ণনা

মাছআলা: (২৪১)

ফতোয়ায়ে আলমগীরির মধ্যে তাহাবী হতে উদ্ধৃত করে বলেন- মাথা মুন্ডানো সুন্নাত এবং আইয়্যাম্মায়ে ছালাছা (ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ ইবনে হাম্বল রা:) এটিকে সুন্নাত বলেছেন। রাওজায়ে জন্দলছের মধ্যেও মাথা মুন্ডানো সুন্নাত লেখেছে।

তবে মোল্লা আলী ক্বারী এবং হাফেজ ইবনে হাজর (রহ:) লেখেছেন যে- মাথা মুন্ডানো খারেজীর আলামত। আর মাওলা আলী (রহ:) এর আনুগত্যের পরিপন্থী **فعل نبوی** (রাসূলের কর্ম) সুন্নাত হতে পারে না। তবে হজ্জ ও ওমরার মধ্যে চুল ছাটানো হতে মাথা মুন্ডানো উত্তম। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চুল মোবারক সমস্ত মাথা মোবারকে ছিল। হজ্জ ব্যতীত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে মাথা মুন্ডানোর কোন প্রমাণ নাই। অধিকাংশ ছাহাবায়ে কেরাম হজ্জ ও ওমরা ব্যতীত **حلق** তথা মাথা মুন্ডাতেন না।[৮৫]

[৮৪]. তাফহীমুল বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা

[৮৫]. (تفسير سوره الم نشرح الكلام الاوضع علامه نقى على خان صاحب, صفحه-১৭৮)

বেদ্আতের বর্ণনা

মাছআলাঃ (২৪২)

বেদ্'আত এর বর্ণনাঃ- বেদ্'আত ঐ সমস্ত নতুন বস্তুকে বলা হয় যা হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত শরীফের পরবর্তীতে ধর্মের মধ্যে সংযোজিত হয়েছে। এটি দু'প্রকার- (১) বেদ্'আতে দ্বালালা যাকে বেদ্'আতে ছাইয়্যেয়াও বলা হয়। (২) বেদ্'আতে মাহমুদা যাকে বেদ্'আতে হাসানাও বলা হয়।

বেদ্'আতে ছাইয়্যেয়া সে সমস্ত নতুন বস্তু বা নতুন সংযোজন যা কোরআন, হাদিস ও ইজ্মায়ে উম্মতের পরিপন্থী হবে। তথা সেই সমস্ত নতুন কর্ম যা এমন বস্তুর অধীন হবে যা খারাপ হওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত আর এটি মাকরূহ ও হারাম।

বেদ্'আতে হাসানা দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে- সে সমস্ত নতুন কথা কিংবা বস্তু কোরআন, হাদিস এবং ইজ্মায়ে উম্মতের পরিপন্থী হবে না কিংবা সেই সমস্ত নতুন কথা যা এমন কোন বস্তুর অধীন হবে যার সুন্দর্য্য শরীয়ত দ্বারা প্রমাণিত হবে। আর যার সংস্করণে (সংযোজন) দ্বীন-ধর্মের মধ্যে শক্তি তথা পরিপূর্ণতা অর্জিত হবে। সে সমস্ত ভাল কর্ম ও কথাকে "বেদ্'আতে হাসানা" বলা হয়ে থাকে। আর এই বেদ্'আত মুস্তাহাব বরং সুন্নাত ও ওয়াজিবের স্তরে পর্যন্ত হয়ে থাকে।

অতএব বলা যায়- যে বেদ্'আত **للدين** তথা দ্বীনের জন্য হবে তা হাসানা ও মাহমুদা আর যেটি **فى الدين** তথা দ্বীনের মধ্যে হবে তা ছাইয়্যেয়া ও মাজ্মুমা।

জানা আবশ্যক কোন নতুন কথা কিংবা বস্তু ছাইয়্যেয়া কিংবা হাসানা হওয়াটা কোন জামানার উপর সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটির সীমাবদ্ধতা কিতাব, হাদিস এবং ইজ্মায়ে উম্মতের পরিপন্থী কিংবা পক্ষ অবলম্বনের উপর সীমাবদ্ধ।

যে সমস্ত হুকুম কোরআন, হাদিস এবং ইজ্‌মায়ে উম্মতের পরিপন্থী না হবে। তা কখনো বেদ্‌'আতে ছাইয়্যেয়া নয়। হ্যাঁ সেটি যে কোন জমানায় হউক না কেন। হযরত ওমর ফারুক (রা:) তাবারীহ সম্পর্কে বলেছেন- **نعمت البدعة هذا** (এটি সর্বোত্তম বেদ্‌'আত) অথচ তারাবীহ হচ্ছে সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাল কর্মের সৃষ্টিকারীকে সুন্নাত প্রতিষ্ঠাকারী বলে এরশাদ করেছেন। এমনিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত নতুন নতুন কথা সৃষ্টি করার অনুমতি প্রদান করেছেন।[৮৬]

খেজাব করার বর্ণনা

মাছআলা: (২৪৩)

কালো খেজাব করা মাকরূহ। পবিত্র হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কালো খেজাব দোযখীদের, তবে সাধারণ খেজাব উত্তম। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু কাহাফা (রা:)কে ফতেহ মক্কার (মক্কা বিজয়ের) দিন এরশাদ করেছেন- "এই বৃদ্ধাবস্থার পরিবর্তন কর এবং কালো খেজাব হতে বিরত থাক।" লাল এবং হলুদ খেজাব করার জন্য বলেছেন। এই দুটো খেজাব মুসলমানদের জন্য। হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রা:) এই উভয় খেজাব লাল ও হলুদ খেজাব সংমিশ্রন করে ব্যবহার করতেন। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজাব করার প্রমাণ নাই। আর সেই হাদিস যেটি মুহাম্মদ ইবনে আক্বীল (রা:) হযরত আনাস (রা:) থেকে নকল করেছেন যে আমি হযরত সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মোবারক খেজাবকৃত দেখেছি, এর মর্মার্থ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওগৌন খুশবু যার মধ্যে **رزدى** এবং **سرخى** রং ছিল লাগায়েছিলেন। এর দ্বারা চুল মোবারক খেজাবকৃত মনে হয়েছিল। না হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজাব

[৮৬]. মিন্‌হাজ আক্কায়েদ, ৬৭ পৃষ্ঠা

দেওয়ার সীমায় পৌঁছেনি অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মোবারক খেজাব করতে হবে সে রকম সাদা হয়নি। শুধুমাত্র উনিশটি চুল মোবারক সাদা হয়েছিল।

সালামের বর্ণনা

মাছআলা: (২৪৪)

সালামের অর্থ নিরাপত্তার দু'আ। তাহিয়্যা অর্থ শান্তির জন্য দু'আ করা।

দুনিয়াবী বিপদ, মানসিক মসীবত, বুযুর্গী, মর্যাদার ও সুস্থতার জন্য দু'আ করা।[৮৭]

মাছআলা: (২৪৫)

কাউকে **سَلَامٌ عَلَيْكَ. سَلَامُ عَلَيْكُمْ** বলার কি হুকুম? তা বৈধ। তবে পরিপূর্ণতার বিপরীত।

মাছআলা: (২৪৬)

عَلَيْكَ السَّلَامُ বলাকি বৈধ? উত্তর তা মাকরূহ। তিরমিযী ও আবু দাউদে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, হযরত জাবের ইবনে সালাম যখন রাসূলের সাথে সাক্ষাত করলেন তখন তখন তিনি **اَلسَّلَامُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ** বললেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি **السَّلَامُ عَلَيْكَ** বলনা, কেননা তা মৃতদের সালাম। এবং তুমি **أَلسَّلَامُ عَلَيْكَ** বল।

মাছআলা: (২৪৭)

সালামের উত্তম পদ্ধতি কি? জবাব: ওয়াও ও বহুবচনের সাথে দেওয়া উত্তম। অর্থাৎ, **وَعَلَيْكُمُ السَّلَامْ** বলবে। এবং **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ** বলাও বৈধ।

[৮৭]. আল ফিকহুল ওয়াহি:খ,৩ পৃ:২৭৭।

কেননা তখন ওয়াও একটি উহ্য বাক্যের দিকে ইশারা করে। অর্থাৎ, اَلسَّلَامُ عَلٰى وَ عَلَيْكُمْ তাতে নিজের উপরও সালাম দেওয়া বুঝা যায়।

মাছআলাঃ (২৪৮)

সালামের জবাবে শেষ শব্দ বারাকাতুহু।

মাছআলাঃ (২৪৯)

সালামের উত্তর ইশারা দ্বারা যথেষ্ট নয়। হ্যাঁ যে ব্যক্তি বোবা বা সে দূরে তখন ইশারা দ্বারা জবাব দেওয়া বৈধ। যদি দূরে না হয় তখন ইশারা দ্বারা সালামের জবাব দেওয়া মাকরূহে তাহরিমী। কেননা তা আহলে কিতাবের আমল। ইহুদীরা সালামের জবাব আঙ্গুলের ইশারা দ্বারা দিয়ে থাকেন। খ্রিষ্টানরা সালামের জবাব হাতের ইশারা দ্বারা দিয়ে থাকেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাদের পদ্ধতি গ্রহণ না করে বিজাতীয় পদ্ধতি গ্রহণ করবে সে তাদের দলের। মোট কথা আঙ্গুল বা হাতের ইশারা দ্বারা সালাম ও সালামের জবাব দেওয়া বিজাতীয় রীতি তাই তা গ্রহণ করা যাবে না।

হ্যাঁ যদি কোন মুসলমান দুরে বা একজনের আওয়ায অপরজন শুনে না তখন মুখে বলে হাতে ইশারা করতে পারবে।

মাছআলাঃ (২৫০)

বোবা ও বধিরকে ইশারা দ্বারা সালাম দেওয়া বৈধ। তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। হাতের ইশারা করে তাদেরকে জবাব দেওয়াতেও পূণ্য রয়েছে।

মাছআলাঃ (২৫১)

আরবীদেরকে আযমী লোক আযমী ভাষায় সালাম দেওয়া ও আযমীদেরকে আরবীরা আযমী ভাষায় সালাম দেওয়া এবং এভাবে জবাব দেওয়া বৈধ।

মাছআলাঃ (২৫২)

মুয়াজ্জিনকে আযানের সময় সালাম দেওয়া মাকরূহ। বাচ্চাদের সালামের জবাব দেওয়া বালেগদের উপর ওয়াজিব।

মাছআলাঃ (২৫৩)

মহিলা মহিলাদেরকে সালাম করা সুন্নাত। পুরুষ মুহরাম মহিলাদেরকে সালাম করা বা বিবিকে সালাম করা বৈধ। সালামের উত্তর দেওয়া মহিলাদের উপর ওয়াজিব। যুবকদের ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। তাই যুবতী মহিলাদের সালাম দেওয়া মাকরূহ এবং যুবতী মহিলাদের পুরুষের সালামের উত্তর দেওয়াও মাকরূহ। কোন পুরুষকে যদি যুবতী মহিলা সালাম দেয় তখন পুরুষ মনে মনে তাকে উত্তর দিবে তেমনি মহিলাও মনে মনে উত্তর দিবে। মহিলাদের দলকে পুরুষের সালাম দেওয়া বৈধ। তেমনি পুরুষের দলে মহিলাদের সালাম দেওয়া বৈধ।

মাছআলাঃ (২৫৪)

ফাসেক যার ফিসক প্রসিদ্ধ যেমন শরাবী, জুয়াখোর, মিথ্যা সাক্ষী প্রদান কারী, পবিত্র মহিলাদেরকে অপবাদ দানকারী, চোগলখোর, গীবতকারী, ইত্যাদি কবীরা গুনাহতে লিপ্ত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া মাকরূহ এবং ধমকি স্বরূপ তাদের সালামের জবাব দেওয়াও মাকরূহ।

যদি কষ্ট দেওয়ার আশংখা হয়, তখন তাদেরকে সালাম দেওয়া ও তাদের সালামের জবাব দেওয়াও বৈধ।

ঘরে প্রবেশের সময় পরিবারকে সালাম দেওয়া মুস্তাহাব। মজলিস থেকে ফারেগ হওয়ার সময় বিদায়ী সালাম দেওয়া উত্তম।

যখন মহান আল্লাহ হযরত আদম (আ:)কে সৃষ্টি করলেন, তখন তিনি ষাট হাত লম্বা ছিলেন তখন আদেশ দিলেন সে ফেরেশতাদের দলে গিয়ে সালাম কর যারা বসে রয়েছে তাই তা তোমার ও তোমার উম্মতের সালাম।

মাছআলাঃ (২৫৫)

হাদিসে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ ، إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيَّ رُوحِي (أى رد على نطقى لأنه فى دائما و روحه لا تفارقه لأن الأنبياء أحياء فى قبورهم) حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) রাসূল (সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, যে কোন ব্যক্তি আমাকে সালাম দিবে তখন মহান আল্লাহ আমার আত্মাকে ফেরত দেন। অর্থাৎ, আমাকে কথা বলার সুযোগ দেন; কেননা; তা আমার ভেতর সব সময় থাকে। (অর্থাৎ তার আত্মা তার থেকে কখনো পৃথক হয় না; কেননা নবীরা তাদের কবরে জীবিত থাকেন।) যাতে আমি তাদের সালামের উত্তর দিত পারি।[৮৮]

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে সালেম হানাফী নিজ হাশিয়াতে লিখেন, এখানে যে কোন ব্যক্তি সালাম দেবে যদিও সে দূরে হোক কবর থেকে; কিন্তু কিছু লোক এখানে নিকটবর্তী হওয়ার শর্ত লাগান। যদি দূরে হয় তখন ফেরেশতা তা তার দরবারে পৌঁছিয়ে দেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে স্বচক্ষে দেখেন যেমন দুনিয়াতে দেখতেন কিন্তু তাকে দুনিয়াতে ধর্ম প্রচারের ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন ও মানুষের সাথে উঠাবসার জন্য তার আত্মা আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত থাকার সাথে; কিন্তু কবরে মানুষের সাথে তার সম্পর্ক নেই। তাই তিনি কথা বলেন না, তবে যখন কেউ তাকে সালাম জানাই, তখন তার সম্মানের জন্য তার আত্মা ফেরত দেওয়া হয় তখন তিনি তার উত্তর দেন।[৮৯]

[৮৮]. তার সনদ হাসান, সিরাজুন মুনীর, খ, ৩, পৃ:২৭৮।
[৮৯]. হাশিয়াতু শায়খুল ইসলাম, খ,৩, পৃ:২৭৮।

মাছআলাঃ (২৫৬)

فحيوا بأحسن منها الخ

এ আয়াত দ্বারা সাধারণভাবে সকলের উপর সালামের উত্তর প্রদান ওয়াজিব বুঝা যায়। অথচ কিছু লোকের উপর ওয়াজিব। তাই জালালাইন প্রণেতা বলেন, সুন্নাত দ্বারা কিছু তা থেকে ভিন্ন রয়েছে। যেমন কোন কাফির সালাম দিলে তখন তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয়। তেমনি ঐ ব্যক্তি যারা বেদাতী অর্থাৎ, সে ইসলামের বিশ্বাস সুন্নাতের বিপরীত আক্বীদা পোষণ করে। যেমন খারেজী ও রাফেযী ইত্যাদি এবং যে ব্যক্তি সুন্নাতের বিপরীত আমল শুরু করবে। যেমন তাজিয়া করা যা তারা পূণ্য মনে করে করে, তেমনি ফাসেক তারা ধর্মে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত। যেমন ঘোষ নেওয়া, গান বাজনা করা, যেনা করা ইত্যাদি। তেমনি কোন ব্যক্তি তার হাজত পূরণ করছে তাকে সালাম দিলে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নই। তেমনি যে ব্যক্তি গোসল খানায় রয়েছে বা যে ব্যক্তি খানা খাচ্ছে তাকে কেউ সালাম করল তখন তার উপর জবাব দেওয়া ওয়াজিব হবে না; বরং শেষোক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকে সালামের উত্তর দেওয়া মাকরূহ। শেষোক্ত ব্যক্তিকে চাইলে জবাব দিতে পারবে। কাফিরের জবাব যদিও ওয়াজিব নয় তবে তা সত্ত্বেও যদি তাকে জবাব দিতে চায় তখন **و عليك** বলে জবাব দিতে পারবে। তাদেরকে আগে সালাম করা সুন্নাত নয়।

আলিমগণ বলেন, এ যুগে উত্তম পদ্ধতি হল, হাতে ইশারা করে নিয়ত বিহীন সালাম দেবে বা আর যদি জিহ্বা দিয়ে বলে, তখন আল্লাহর নেক বান্দাহদের নিয়ত করবে, ফেরেশতাদের নিয়ত করবে, বাহ্যিকভাবে তাকে দেওয়া হবে।

নামাযী ব্যক্তিকেও সালাম দেওযা সুন্নাত নয় বা কেউ আযান দিচ্ছে বা খুতবা পড়ছে বা সে দু'আ করছে তাদেরকেও সালাম দেওয়া সুন্নাত নয়। তাদের উপর জবাব দেওয়াও ওয়াজিব নয়। যে ব্যক্তি শব্দ দিয়ে কোরআন

পড়ছে বা হাদিস শরীফ বর্ণনা করছে বা জ্ঞান চর্চা করছে তাকেও জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়। মুলাকাতের সময় সালাম দেওয়া সুন্নাত। ছাত্র যদি সবক নেওয়ার জন্য আসে তখন তার সালামের উত্তর দেওয়া তার উপর ওয়াজিব নয়। সালাম সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ জবাব দেওয়া ওয়াজিব। যে ব্যক্তি সালামের উত্তর দেয়না তার আত্মা খারাপ হয়ে যায় পাপের কারণে। তখন সালাম প্রদানকারীকে ফেরেশতারা উত্তর দেন। তাফসিরে মাদারিকে এসেছে, ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি দাবা খেলে বা সেরকম অন্য কোন খেলনায় সে ব্যস্ত বা গান গাইছে বা কবুতর দিয়ে খেলা খেলছে তখন তাদেরকে সালাম দিবে না। একা হলে সালাম দেওয়া সুন্নাতে আইন, আর যদি একদল হয় তখন সুন্নাতে কেফায়া অর্থাৎ পুরো দল থেকে একজন যদি সালাম দেয় তখন সকলের জিম্মাদারী থেকে সালাম আদায় হবে; তবে সওয়াব পাবে যে সালাম দিয়েছে। আর যদি সকলে সালাম করেছে তখন সকলকে সওয়াব দেয়া হবে। যদি একজন ব্যক্তিকে একদল সালাম দিল তখন একটি উত্তর সবার জন্য যথেষ্ট হবে, আর যদি একদল হয় তখন সকলে উত্তর দেওয়া উত্তম, আর যদি একজন উত্তর দেয় তখন সকলের পক্ষ থেকে আদায় হবে; তাই পুরো দলের পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া ওয়াজিবে কেফায়া এবং জবাব হঠাৎ দেওয়া ওয়াজিব। একদলের পক্ষ থেকে যদি একজন নাবালেগ বাচ্চা উত্তর দেয় তখন তা আদায় হবে না; কেননা সালামের উত্তর নিরাপত্তা দেওয়া, ছোট বাচ্চা নিরাপত্তা দিতে পারে না। তবে তারাবীর নামাযে কিছু পরবর্তী আলিমগণ তাদের ইমামতি বৈধ বলেছেন, যদি সে হাফিয হয়।[৯০]

কিয়ামত দিবসে উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা

[৯০]. মওয়াহেব, পারা, ৫, পৃ:১৪৪।

মাছআলা: (২৫৭)

হযরত আবু বুরদা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا كان يوم القيامة يعطى كل رجل من المسلمين رجلاً من اليهود والنصارى فيقال: هذا فداؤك من النار).

অর্থ: রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কিয়ামত প্রতিষ্টিত হবে তখন প্রত্যেক মুসলমানদেরকে এক-একজন ইহুদী-খ্রিষ্টান দেওয়া হবে এবং বলা হবে এটি তোমাদের জন্য আগুনের ফিদিয়া।

তিনি বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সাহাবাদেরকে বলেন, তোমরা কি রাজী তোমরা সকল উম্মতের তুলনায় জান্নাতের এক চুতুর্থাংশ হবে?

তারা বলেন, নিশ্চয়। অত:পর তিনি বলেন, তোমরা কি রাযী তোমরা জান্নাতের এক চতুর্থাংশ হবে সকলে বললেন, হ্যাঁ অত:পর তিনি বললেন, তোমরা কি রাযী জান্নাতের অর্ধেক হবে সকলে বললেন হ্যাঁ। অত:পর তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো জান্নাতী একশ বিশ কাতার হবে সেখানে আমার উম্মত হবে আশি কাতার।

হযরত আবু বুরদা (রা:) তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন সকলকে সিজদার দিকে আহ্বান করা হবে তখন কাফিররা সিজদা দিতে পারবে না আমার উম্মত সকল উম্মতের পূর্বে দু'টি সিজদা দিবে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, অত:পর আমার উম্মতকে বলা হবে তোমরা মাথা উঠাও আমি তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের দুশমন ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে তোমাদের ফিদিয়া বানালাম।

এ মর্যাদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এবং তার খাতিরে তিনি উম্মতকে এ মর্যাদা দান করবেন, তাদের দুশমন ইহুদি খ্রিষ্টানকে দোযখের আগুনের জন্য ফিদিয়া বানাবেন। হযরত আবু বুরদা থেকে বর্ণিত, রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মত দায়িত্ব প্রাপ্ত উম্মত। তাদের শাস্তি দুনিয়াতে তাদের হাতে হবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তা হত্যা ও লুটপাটের মাধ্যমে হবে।

বায়হাকী, হাকেম, তাবরানীতে আবু মুসা থেকে বর্ণিত, আমার উম্মত রহমপ্রাপ্ত, তাদের উপর পরকালে শাস্তি হবে না; তবে তাদের শাস্তি দুনিয়াতে ভুমিকম্প, হত্যা ও বিভিন্ন প্রকার মসীবতের মাধ্যমে হবে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমার উম্মত রহমপ্রাপ্ত তাদের শাস্তি দুনিয়াতে তাদের হাতে হবে।

হযরত যিয়াদ তিনি ইয়াযিদ ইবনে হারেছ থেকে, তিনি আবু মূসা (রা:) থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মত বিভিন্ন ধরনের তা'আন তথা তীর মারাামরি ও তাউন দ্বারা ধ্বংস হবেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, তীর নিক্ষেপ তো বুঝি তবে তাউন কি? তখন তিনি বলেন, তা হল জিন্নাত তোমাদের স্পর্শকরণ। এভাবে মরলে শহীদ হবে।[৯১]

এখানে তীর বলতে ইহুদী খ্রিস্টান ও মুশরিকদের তীর নিক্ষেপ। বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দু'জনই জাহান্নামী।

বেলায়ত ও অলীর বর্ণনা

মাছআলা: (২৫৮)

অলীগণ তার বেলায়তের কাজের বিপরীত কাজের কারণে নিজ সে স্থান থেকে বরখাস্ত হতে পারে। নবীগণ তাদের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত হতে পারে না।

ইমাম আবুল কাশেম কুশাইরী বলেন, অলীর দু'টি অর্থ একটি **فعيل** অর্থ **مفعول** তথা অলী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে আল্লাহ তায়ালাকে নিজের সকল কাজে মুতওয়াল্লী বানায়। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, **وهو**

[৯১]. মুসনাদ:৩৩।

يتولى الصالحين অর্থ, তিনি নেককারদের জিম্মাদার। কেননা; নিজকে জিম্মাদার বানানো ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়তঃ এটি মুবালেগার শব্দ। অর্থাৎ, অলী বলা হয়, যে নিজে আল্লাহর ইবাদতে নিজকে লিপ্ত রাখে। তাই যার ভেতরে এই দু'টি গুণ পাওয়া যাবে সে অলী।

মাছআলাঃ (২৫৯)

(**وِلايت**) বেলায়ত ও (**وَلايت**) বলায়েতের মাঝে কি পার্থক্য?

উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। (**وِلايت**) বেলায়ত বলা হয় মুরীদকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেয়ে দেওয়া এবং তাসাউফের আদব ও পদ্ধতির শিক্ষা দেবে। যা আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহদের মাধ্যম এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং মুরীদের মাঝে মাধ্যম হবে তাকে (**وَلايت**) বলায়েত বলা হয়। যখন কোন শেখ দুনিয়া থেকে চলে যায় তখন সে তার (**وَلايت**) বলায়েত নিয়ে যায়। কিন্তু সে (**وِلايت**) বেলায়ত কাউকে দিয়ে যায়। তাই (**وِلايت**) বেলায়ত ও (**وَلايت**) বলায়েত দু'টি একজন পীরে কামেলের অর্জিত হয়। যদি দুনিয়াতে সে কাউকে যদি দিয়েও না যায় তখন আল্লাহ নিজেই তা কাউকে দিয়ে দেন। কিন্তু (**وَلايت**) বলায়েত তার সাথে থাকে। তাই যে কোন পীর ও তার মুরীদের মাঝে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে।[৯২]

হযরত নেযামুদ্দীন আউলিয়া নিজের এক মুরীদকে কোন বুযুর্গের নিকট পাঠালেন, গত রাতে আবু সায়ীদ আবুল খায়ের মৃত্যু লাভ করেছে তখন তিনি তার (**وَلايت**) বলায়েত কাকে দান করেছেন?

সে বুযুর্গ উত্তরে বলেন আমি জানিনা অতঃপর সে বুযুর্গের ইলহাম হল সে তার বেলায়ত শমসুল আরেফীনকে দিয়েছেন সে রাতে মানুষ শমসুল আরেফীনের দরবারে গেলেন শমসুল আরেফীন তাদেরকে বললেন, আল্লাহর নিকট অনেক শমসুল আরেফীন আছে, সেই নিয়ামত কাকে দিয়েছেন তা অজানা ।

[৯২]. সীরাতঃ৫৪৬, ৫৪৭।

মাছআলাঃ (২৬০)

এ দুনিয়াতে কিছু আউলিয়াদের কি মুশাহেদার নিয়ামত অর্জিত হয়েছে? হযরত নেযামুদ্দীন আউলিয়া উত্তর দিলেন হ্যাঁ।

তার দৃষ্টান্ত কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠেছে তখন সে তার প্রিয়কে তার নিকট পায় এবং সে যখন এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় তখন মনে হয় সে স্বপ্নের ঘুম ভেঙ্গেছে এবং সে তার প্রিয়ের তালাশে ছিল তাকে পেয়েছে। তখন তাদের অনেক খুশি হয়। হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি যে বস্তুর মধ্যে ডুবে যায় সে যখন মরে যায় তখন তাকে তার সেই আশা দেওয়া হয়।[৯৩]

মাছআলাঃ (২৬১)

নবীদেরকে মৃত্যুর সময় খবর দেওয়া হয় যে, তারা চাইলে দুনিয়াতে থাকবে বা তারা নিজ মাওলার নিকট চলে যাবে। সেরকম অলীদের কি ইখতিয়ার দেওয়া হবে?

হ্যাঁ যেহেতু আল্লাহর অলীরা নবীদের খলীফা তাই আউলিয়াদের সে রকম ইখতিয়ার দেওয়া হয়। তারা এই দুনিযাতে থাকুক বা না থাকুক। শায়খ নেযামুদ্দীন আউলিয়ার যখন মৃত্যু রোগ এসেছে শায়খ রুকুনুদ্দীন মুলতানী মুলাকাতের জন্য এসেছে তখন শেখ রুকুনুদ্দীন বলেন, হে শায়খ আপনি আল্লাহর দরবারে আপনার কিছু জীবনের আবেদন করুন যাতে অসম্পূর্ণরা পরিপূর্ণতা লাভ করে। তখন সুলতানুল মাশায়েখ অশ্রু ঝরে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্ন দেখেছি তিনি বলেন, নেযাম আমি তোমার সাথে মুলাকাত করতে চাচ্ছি। একথা শুনামাত্র হযরত নেযামুদ্দীন ও উপস্থিত সকলে ক্রন্দন করা আরম্ভ করেছেন। এর কিছুক্ষণ পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

মাছআলাঃ (২৬২)

[৯৩]. সিরাতুল আউলিয়া, পৃ:৫৪৮, কারামত বা হরখে আদাতের প্রকারভেদ ও আউলিয়াদের পরিচয়, পৃ:৫৪৮।

আল্লাহর অলীদের কষ্ট দেওয়া খারাপ মৃত্যু হওয়ার আশংখা রয়েছে ।[৯৪]

মাছআলাঃ (২৬৩)

আউলিয়াদের কারামত মৃত্যুর পরেও প্রকাশিত হয় যেমন জীবিত থাকতে হয়। তাতে চার মাযহাবের আলিমদের একমত। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা।[৯৫]

তাই বলা হয়, যার কারামত মৃত্যুর পরে প্রকাশ পাবে না সে সত্য নয়। কিছু মাশায়েখ বলেন, আল্লাহ অলীদের কবরে একজন ফেরেশতা ঠিক করে দেন যে চাহিদা পূরণ করে। অনেক সময় অলী নিজ কবর থেকে বের হয়ে চাহিদা পূরণ করে দেয়।

মাছআলাঃ (২৬৪)

আল্লাহর অলীরা কি নিষ্পাপ?

অলীরা নিস্পাপ নন, তা নবীদের গুণ; বরং অলীরা মাহফুজ তথা সংরক্ষিত।[৯৬]

মাছআলাঃ (২৬৫)

আল্লাহর অলী কাকে বলা হয়?

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীয়তের অনুসরণ করে বিশুদ্ধ আক্বীদা রাখে সেই আল্লাহর অলী।[৯৭]

যে ব্যক্তি আল্লাহর যাত-সিফাত জানে, পাপ বর্জন করে, ইবাদতে মশগুল থাকে, দুনিয়ার খায়েশে লিপ্ত হয় না, শরীয়তের গন্ডিতে থাকে, সে আল্লাহর অলী; যদিও তার থেকে কোন কারামত পাওয়া না যায়।

---

[৯৪]. তানবীরুল কুলুবঃ২২২।
[৯৫]. তানবীরুল কুলুবঃ৩২৩
[৯৬]. তানবীরুল কুলুব
[৯৭]. তানবীরুল কুলুবঃ৩২৩।

ولى শব্দটি **فعيل** এর ওযনে যার অর্থ **فاعل** তথা যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে ঠিক রাখে আল্লাহর আদেশ নিষেধের হেফাযত করে বা তার অর্থ **مفعول** তথা যাকে আল্লাহ মুহাব্বাত করে তার আমলকে ঠিক রাখে।

সারকথা হল, আল্লাহর অলী বলা হয়, এমন আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি তার সাধ্যমতে আল্লাহর ইবাদত করে, সাধনা করে, আল্লাহর যাত সিফাতকে সবসময় মুহাব্বাত রাখে, তার ইবাদতে সবসময় বিনয় থাকে, পাপ থেকে বিরত তাকে। দুনিয়ার বাসনা থেকে বিরত থাকে বৈধ চাহিদা থেকেও সাধ্যমতে বিরত থাকে পরকালকে প্রধান্য দেয় ।

মাছআলা: (২৬৬)

কারামাতের কি অর্থ? তা কত প্রকার?

অস্বাভাবিক ঘটনাকে কারামত বলে যা বেলায়তের পরিচয়। এর বিপরীতে নবুয়তের দাবী করা তা মিথ্যা। অস্বাভাবিক ঘটনা যা মানুষদের থেকে প্রকাশ পায় তা ছয় প্রকার:

১. মুজেযা ২. ইরহাছ এ দু'টি নবীদের থেকে প্রকাশ পায়। প্রথমটি নবুয়তের পরে দ্বিতীয়টি নবুয়তের আগে ৩. কারামত তা অলীদের থেকে পাওয়া যায়। ৪. মাউনা তা প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানদের থেকে পাওয়া যায়। ৫. ইসতিদরাজ ৬. ইহানাত এ দু'টি ফাসিকদের থেকে পাওয়া যায়। এমনকি তা কাফির ও মুশরিকদের থেকেও পাওয়া যায়। তা অনেক সময় যাদু ইত্যাদির মাধ্যমে বা মিথ্যার মাধ্যমে পাওয়া যায়। যেমন মুসাইলামা এক অন্ধের জন্য দু'আ করেছিল সে ভাল হয়ে গেছে। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যা চোখের জ্যোতি চলে যাচ্ছে সে মুসাইলামা কায্যাবের নিকট আসল এবং দু'আ চাইল তখন তা ভাল হয়ে গেল।[৯৮]

মাছআলা: (২৬৭)

[৯৮]. নুখবাতুল লা'আলী, ৭২।

আল্লাহর অলীরাও কি সাধারণ মানুষের মত মসীবত ভোগ করেন। হ্যাঁ আল্লাহর অলীরাও সাধারণ মানুষের মত মসীবত ভোগ করেন। হাদিসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اشد البلاء على الأنبياء ثم على الأولياء ثم الأمثل فالأمثل

অর্থ: সবচেয়ে বড় মসীবতে পড়েন আল্লাহর নবীরা অত:পর আল্লাহর অলীদের জন্য অত:পর যারা তাদের পরে রয়েছে।

এবং এও রয়েছে মসীবতের সময় ফেরেশতারা নবীদের সহযোগীতা করেন।[৯৯]

অলীদের জন্য মসীবত আসা নিশ্চিত। সাধারণ মানুষ থেকে মসীবত অনেক সময় ভাল কাজ করলেই চলে যায়। অলীদের জন্য মসীবত আসা মর্যাদা উঁচু করার হাতিয়ার।

ফায়দা: এখানে মসীবত থেকে শুধু শারীরিক রোগ নয়; বরং নবীদের মসীবত হল, তারা যেহেতু নবুয়ত ও বেলায়ত দু'টির অধিকারী দু'টি একত্র হওয়া দুট'ার মাঝে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা নবীদের জন্য অত্যন্ত কঠিন। বেলায়তের দৃষ্টি আল্লাহর দিকে, আর নবুয়তের দৃষ্টি বান্দাহর দিকে, নতুবা কোন নবী শারীরিক রোগ তথা শ্বেত, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত ছিলেন না।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে দাউদ দামেস্কী বলেন, তাসাউফ ও শান্তি একত্র হতে পারে না।[১০০]

মাছআলা: (২৬৮)

খাওয়ারেক তথা কারামত দু'প্রকার। ১. ইচ্ছাধীন। ২. অনিচ্ছাকৃত।

[৯৯]. সকীনাতুল আউলিয়া, ১০৭।

[১০০]. সকীনা।

ইচ্ছাধীন কারামত হল, আহলে দাওয়াতের। তা তারা আল্লাহর কোনো না কোনো নাম যিকির করে থাকেন এবং সে উদ্দেশ্য আল্লাহর নামের বরকতে অর্জিত হয়।

২. অনিচ্ছাধীন কারামত হল যা আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে দান করা হয়। যতদূর সম্ভব এ ধরণের আস্বভাবিক ঘটনাকে গোপন রাখা চায়।[১০১]

মাছআলা: (২৬৯)

প্রবাদ আছে যে, খারাপ চরিত্র যখন কারো স্বভাব হয়ে যায়, তখন তা মৃত্যুর পরে পৃথক হয়। তার অর্থ হল, এখানে মৃত্যু থেকে স্বাভাবিক মৃত্যু বুঝানো হয়নি। কেননা অনেক আল্লাহর ওলী রয়েছে যারা তাওবা করার পর আল্লাহর অলী হয়ে যায়। তাই এটি কিভাবে বলা যায় যে, খারাপ অভ্যাস মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে। সে রকম বিশ্বাস না রাখা চায়। এখানে আত্মার ও কুপ্রবৃত্তির মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়: **موتوا قبل ان تموتوا** তোমরা মৃত্যুর পূর্বে মর। প্রকৃত মু'মিনরা উভয় জাহানে জীবিত। আল্লাহর অলী হাফেয শীরাযী বলেন, ঐ ব্যক্তি কখনো মরে না যার অন্তর ইশক দ্বারা জীবিত। কেননা; আল্লাহর অলীরা মরে না তারা একস্থান থেকে অন্য স্থানে যায়; বরং একটি স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া হয়।[১০২]

মাছআলা: (২৭০)

রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়ার ব্যাপারে কি হুকুম?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া যমীনে পড়ে না। এ ব্যাপারে হযরত যাকওয়ান নওয়াদেরুল উসূলে এক বর্ণনায় বলেন যে, যদিও আলিমগণ এ কথার ব্যাপারে সমালোচনা করেন; কিন্তু বড় সুফীগণ একথা স্বীকার করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া যমীনে পড়ে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া যমীনে না পড়ার কারণ হল, তার পবিত্র আত্মাও যেমন সরু তেমনি তার পবিত্র শরীরও সরু মত

[১০১]. সাকীনাতুল আউলিয়া: ১২৪
[১০২]. সাকীনাতুল আউলিয়া:১১২।

হয়ে গেছে এবং শরীরের সরুতার কারণে তার কাপড়ও সরুর মত। আর নূরানী শরীরের ছায়া হয় না; কেননা ছায়া মোটা হলে হয়।[১০৩] হায়াতুল ইসলাম কিতাবে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছায়া যমীনে পড়ে না।

মাছআলা: (২৭১)

আল্লাহর অলীদের আত্মা শরীর থেকে পৃথক হওয়ার পর তার আত্মাকে কি দুনিয়ার স্বাদ বুঝার ও কাজের সুযোগ দেওয়া হয়?

মৃত্যুর পরে আল্লাহর অলীদের একই ধরনের ক্ষমতা থাকে; বরং মৃত্যুর পরে তার দৃষ্টিশক্তি, ক্ষমতা আরো বেশী বেগবান হয়। কেননা জীবনে তো শারীরিক ও কাপড় ইত্যাদির বেষ্টনী থাকে। কিন্তু মৃত্যুর পরে পর্দা উঠে যায়। যেমন কোন তলোয়ার যখন তার কোষ থেকে বের হয়ে আসে তখন তা আরো তেজ দেখা যায়। আর যে তলোয়ার কোষের ভেতর থাকে তার চেয়ে। তেমনি আল্লাহর অলীদের আত্মা শরীর থেকে বের হয়ে আসার পর আরো শক্তিশালী হয় এবং সে আরো বেশী কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই আল্লাহর অলীদের মৃত্যুর পরে উন্নতি হয়।[১০৪]

হিকমাত:

তাই আমি বলি ওলামায়ে যাহের ও তাদের অনুসারীদের ঈমান দলীল ভিত্তিক। এরকম ঈমান মৃত্যুর পরে শেষ হয়ে যায়; কিন্তু ঈমান ও আমলের কারণে তারা জান্নাতী। আর আল্লাহর অলীদের ঈমান চাক্ষুষ এরকম ঈমান মৃত্যুর পরেও ধ্বংস হয় না; বরং তাদের শক্তি আরো বেগবান হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশের সাথে আরো বেশী শক্তিশালী হয়। তারা জান্নাতে প্রবেশের সাথে আল্লাহর দরবারে দীদার লাভ করে। তাই বলা হয়, আল্লাহর অলীরা ইন্তেকালের পরে মরে না, আলিমগণ প্রথমে আস্তে আস্তে দলীল ভিত্তিক ঈমানের দাওয়াত দেন তারা আস্তে উন্নতি লাভ করতে করতে

[১০৩]. সাকীনাতুল আউলিয়া:১১৩।

[১০৪]. সাকীনাতুল আউলিয়া:১১৪।

অলীদের দাওয়াতের অসীলায় নগন্য সংখ্যক লোকদের চাক্ষুষ ঈমান নসীব হয়। তারা উভয় জাহানের জীবন লাভ করে।

জ্ঞান অর্জনের ফজিলত

মাছআলা: (২৭২)

আলিম দুই প্রকার: একটি বাহ্যিক আলিম দ্বিতীয়টি গোপনীয় আলিম। যে সকল আলিম নবীর উত্তরাধিকার তারা প্রতিরাতে বা জুমারাতে বা প্রতি মাসে বা প্রতিবছরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যিয়ারত লাভ করেন। যাদের এরকম হবে না তাদের জ্ঞান তাদের কল্যাণ আনে না। এরকম আলিম গাধার মত অজ্ঞ। তারা মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্চমানের। মানুষকে কষ্টদানকারী।

মাছআলা: (২৭৩)

যদি সকল আলিম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, যাহেদ, আবেদ, মুত্তাকী, হাকিম, জীবিত হোক মৃত হোক এবং সকল জ্বীন ও মানুষ এক স্থানে একত্র হয় তখনও তারা আল্লাহর অলীদের একঘন্টা ফিকিরের শুরুতেও পৌঁছতে পারবে না। তাদের চিন্তা এমন হয় যে, তারা তাদের নখে উভয় জাহান দেখতে পান; কেননা একটি ঘন্টা চিন্তা করা সকল মানুষের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।[১০৫]

মাছআলা: (২৭৪)

সকল বেঠক থেকে ইলমের বৈঠক সবচেয়ে উত্তম। একসময় হযরত নেযামুদ্দীন আউলিয়া, শায়খ রুকুনুদ্দীন ও মাওলানা ইমাদুদ্দীন একটি মজলিসে বসেছে তখন শায়খ মাওলানা ইমাদুদ্দীন বলেন, উত্তম মজলিস হল ঐ মজলিস যেখানে কোনো জ্ঞানের আলোচনা হয় অত:পর একটি প্রশ্ন করা হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনা শরীফ হিজরতের কি কারণ? তখন তার উত্তরে শায়খ রুকুনুদ্দীন বলেন, যে মর্যাদা ও কামালাত রাসূলের জন্য ফায়সালা করা হয়েছে তা পরিপূর্ণ করার জন্য

[১০৫]. আকলে বেদার:১৬।

মদীনা শরীফ হিজরত করতে হয়েছে। যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসহাবে সুফ্ফার সাথে মদীনা শরীফে তাশরীফ আনলেন, তখন তার সেই মর্যাদা পরিপূর্ণ হয়েছে। মাহবুবে ইলাহী শায়খ নেজামুদ্দীন বলেন, ফকীরের অন্তরে তার আরেকটি কারণ অন্তরে আসে যা কোন তাফসিরে পাওয়া যায় না তা হল, রাসূলের ইশারা ও তাবলীগ দ্বারা মক্কাবাসীরা তো কল্যাণ অর্জন করলেন এবং ইসলামের দাওয়াত অর্জন করলেন কিন্তু অপরিপূর্ণ সে দল যারা মদীনায় রয়ে গেছেন তারা রাসূল পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না তাদের জন্য রাসুলকে আদেশ দিলেন আপনি মক্কা থেকে মদীনা হিজরত করেন যাতে আপনার মাধ্যমে অসম্পূর্ণরা পরিপূর্ণতা লাভ করেন।[১০৬]

মাছআলাঃ (২৭৫)

যিকির ও নফলের সাথে লিপ্ত থাকার চেয়ে জ্ঞান অর্জনে লিপ্ত থাকা উত্তম।[১০৭]

মাছআলাঃ (২৭৬)

সাধারণ মানুষের যিকিরে লিপ্ত থাকার চেয়ে জ্ঞানের আলোচনা ও ওয়াযে যাওয়া উত্তম।[১০৮]

মাছআলাঃ (২৭৭)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব বলেন, মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তায়ালা আলিমদের বৈঠকের চেয়ে দুনিয়াতে উত্তম মাটি সৃষ্টি করেননি। আতা ইবনে রেবাহ বলেন, ইলমের বৈঠকে যাওয়া সত্তরটি বাজে কথার মজলিসের কাফ্ফারা হয়ে যায়।

মে'রাজের বর্ণনা

মাছআলাঃ (২৭৮)

[১০৬]. আউলিয়া:২৫৬।
[১০৭]. তানবীরুল কুলুব:৩১৭।
[১০৮]. তানবীরুল কুলুব:৩১৭।

যারা ইসরা ও মিরাজকে অস্বীকার করবে তাদের কি হুকুম?

যারা ইসরা ও মেরাজকে অস্বীকার করবে তারা কাফির এবং যারা মেরাজকে অস্বীকার করবে তারা ফাসিক। আর ইসরা হল মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। যা কোরআন ও হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। তাই যারা তা অস্বীকার করবে তারা কাফির এবং মেরাজ হল, মসজিদে আকসা থেকে সাত আসমান পর্যন্ত যা প্রসিদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তা অস্বীকার কারী ফাসিক।[১০৯]

মাছআলা: (২৭৯)

আরশের উপরে মেরাজে যাওয়া কি প্রমাণিত?

হ্যাঁ এ ব্যাপারে সীরাত কিতাবে রয়েছে যে, আরশের উপরে তাশরীফ নেওয়ার কথা রয়েছে। তবে মুহাক্কিকীনগণ বলেন, এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।[১১০]

ইমাম ইবনে আসাকির বলেন, হাদিসের ভাষা দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহর নিকবর্তী হওয়া তা আরশের উপরে। তাই তার নিকবর্তী হওয়া দ্বারা আরশের উপরে বুঝা যায়।[১১১]

শরহে সালাম রেযাতে ইবেন খেফাযীর বরাত দিয়ে এসেছে, হযরত জিব্রাইল (আ:) রফরফ নিয়ে উপস্থিত হন। তখন তিনি তাকে আরশে নিয়ে যাওয়া হল। তাই তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।[১১২]

নবী-রাসূল পাঠানোর হিকমত

মাছআলা: (২৮০)

[১০৯]. জাওহারাতুত তাওহীদ, ১৪২।
[১১০]. জাওহারাতুত তাওহীদ, ১৪২।
[১১১]. শরহে সালাম রেযা, ১০১।
[১১২]. শায়খ মুহাদ্দিস আব্দুল হক দেহলভী, মাদারেজুন নবুয়্যাহ, ১০২।

রাসূল ও নবী পাঠানোর কি হিকমত: এ ব্যাপারে জানা উচিত তার কি উদ্দেশ্য। তার জবাব হল, তার উদ্দেশ্য হল তা মানুষের সংশোধনের জন্য ও মানুষের নিকট আহকাম পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত করা হয়। তারা সকলে হক তারা সকলে নিষ্পাপ তাদের উপর ঈমান আনা হক।

رسل শব্দটি **رسول** এর বহুবচন। রাসূল পাঠানোর হিকমাত হল, মহান আল্লাহর সত্ত্বা সকল ধরণের নাপাক ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র এবং মানুষ সকল দোষে দোষী এবং মানুষ সকল ধরণের পাপে যুক্ত তাই মাধ্যম বিহীন মানুষের সাথে কথা বলা আল্লাহর শানের সাথে যথাযোগ্য নয়। তাই তিনি এমন কিছু প্রতিনিধি ঠিক করেছেন যারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মানুষ কিন্তু ভেতরে তারা সকল ধরণের পাপ পঙ্কিলতা থেকে পুত:পবিত্র ও নিষ্পাপ। তাই তাদের সাথে আল্লাহর সাথেও সম্পর্ক বিদ্যমান, সাথে সাথে মানুষের সাথেও রয়েছে। এভাবে তারা আল্লাহর বিধান ও আদেশ নিষেধ নিয়ে মানুষের মাঝে পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে তারা মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে করতে সক্ষম হন।[১১৩]

এ হিকমাত থেকে বুঝা গেল, রাসূল আমাদের মত সাধারণ মানুষ নয়। তাদের সত্ত্বা পবিত্র মানুষের সত্ত্বা নাপাক তা মেনে নিলে অনেক ঝগড়া ফাসাদের নিরসন হয়।

নিশ্চুপ থাকার ফজিলত

মাছআলা: (২৮১)

যে সকল মানুষ অফুরন্ত জীবন অর্জন করতে পেরেছে সে সফলকাম এবং যে ব্যক্তি শুধু দাবির মধ্যে রয়ে গেছে সে নিজ বয়সকে ধ্বংস করল।

آں زباں دیگر است باحق بیاں ☆ ای زباں لاف زن دیگر بداں

[১১৩]. দরসে মিশকাত: খ, ১ পৃ:৫৩

সত্য বর্ণনাকারী ভাষা ভিন্ন ধরণের এবং এ বকবকানী অন্য ধরণের।

প্রবাদ রয়েছে যে,

جو بادل زیادہ گرجتے ہیں برستے نہیں

যে মেঘ গর্জে বেশী বর্ষে কম।

نہد شاخ پر میوہ سر برزمین:

ফলে ভরা শাখা যমীনে ঝুকে যায়।

তাই বলা হয়, **السكوت تاج المؤمنين** নিশ্চুপ থাকা মু'মিনের মুকুট এবং **السكوت مفتاح العبادة** নিশ্চুপ থাকা ইবাদতের চাবি। **السكوت من رحمة الله** নিশ্চুপ থাকা আল্লাহর রহমত। **السكوت حصار من الشيطان**নিশ্চুপ থাকা শয়তানের ঘেরা। **السكوت سنة الأنبياء** নিশ্চুপ থাকা নবীদের সুন্নাত।**السكوت نجاة من الناس** নিশ্চুপ থাকা মানুষের মুক্তির পথ।**السكوت قرب الرب** নিশ্চুপ থাকা নৈকট্যের কারণ। **السكوت فى النور** নিশ্চুপ থাকা তাওহীদে নূর সৃষ্টি করে।

এ ধরণের নিশ্চুপ সব সময় আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে হয় ও উপস্থিতির কারণ হয়। আল্লাহর দর্শনে রাখে এবং তাকে লাহুতের স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষের নিশ্চুপ হল শরীরকে প্রাণ থেকে পৃথক করবে এবং তাকে অসীম স্থানে ডুবিয়ে দেয় যেই নিশ্চুপ এর বিপরীত হবে তা ধোঁকাবাজি তা শুধুমাত্র লোক দেখানো তা আম্মারা নফসের চাহিদা।[১১৪]

جز بقائش معرفت منظور نیست: عارفاں را جز خدا منظور نیست

অর্থ: তার জন্য অবিশষ্ট ছাড়া কিছুই নেই; কিন্তু যারা আল্লাহ ওয়ালা তাদের নিকট আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই।

[১১৪]. কলিদুত তাওহীদ:১৯।

শেষ যুগে আলেম ও অজ্ঞদের অবস্থার বর্ণনা

মাছআলা: (২৮২)

عن ابى هريرة رضى الله تعالٰى عنه قال قال رسول الله ﷺ سيأتى على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذبٌ فيها الصادق ويوتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرّويبصة۔

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বি আল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন– লোকদের নিকট এমন একটি বছর (যুগ) আসবে যাতে থাকবে কেবল মাত্র ধোকা আর ধোকা (ফ্রট আর ফ্রট), যে সময় মিথ্যাকে সত্য হিসেবে বুঝানো হবে আর সত্যকে মিথ্যা হিসেবে প্রমাণ করবে, খেয়ানতদারকে আমানতদার, আর আমানতদারকে খেয়ানতদার হিসেবে বুঝাবে। আর সে যুগে অজ্ঞ ও মুর্খ খুবই বক্তা হবে অর্থাৎ নীচক ও অনুপযুক্ত ব্যক্তির জন্য লোকগণ শানদার ব্যবস্থা করবে। অজ্ঞ ও নাআহাল লোকগণ আলেম হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে আর যারা সত্যিকারের জ্ঞানী সমাজে তাদের কদর হবে না। যা বর্তমানে পরিলক্ষিত। আল্লাহ পাক আমাদের হিফাজত করুন।

রাসূল ﷺ অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী

মাছআলা: (২৮৩)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

অর্থ: গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জ্ঞাত নয়।[১১৫]

এ আয়াতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো থেকে ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যতীত কারো নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান নেই।

[১১৫]. আন'আম: ৫৯।

এখানে ইলমে গায়েবকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অন্য থেকে তা অস্বীকার করা হয়েছে। এ আয়াতের মর্মার্থ মুফসসিরীনরা দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন- ১. তাফসিরে কবীরে এসেছে সকল অসীম বস্তুর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারো নিকট নেই। ২. যে সত্ত্বা সকল সম্ভাবনাময় বস্তুর উপর সাধারণভাবে ক্ষমতাধর তিনি আল্লাহ। অর্থাৎ, ইমাম খাযেন এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, তা দ্বারা উদ্দেশ্য সকল সম্ভাবনাময় বস্তুর উপর একমাত্র তারই ক্ষমতা।

আমার নিকট ঐ ব্যাখ্যাটি উত্তম যা ইমাম শেহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ যিনি সমীন হালবী নামে প্রসিদ্ধ (মৃত:৭৫৬হি) যিনি তাফসিরে বাহরে মুহীত প্রণেতা ইমাম আবু হায়্যান আন্দালুসীর শিষ্য। তিনি বলেন, এখানে **مفاتيح** শব্দটি **مفتح** এর বহুবচন। যার অর্থ খোলা। অর্থাৎ, তার নিকট ইলমে গায়েব খোলার উপাদান রয়েছে এবং তিনি তার বান্দাহ থেকে যাকে চান ইলমে গায়েব খুলে দেন। তখন তা **مفتح** মাসদারের বহুবচন হবে। তখন অর্থ দাঁড়াবে মহান আল্লাহর নিকট অদৃশ্য খোলার ব্যবস্থা রয়েছে তিনি তার বান্দাহ থেকে যাকে চান তাকে অদৃশ্য খোলে দেন ।

তখন তো না বোধক হ্যাঁ বোধক হয়ে যায়। যে আয়াত দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করা হয়, সে আয়াত তার জন্য ইলমে গায়েব প্রমাণের দলীল হয়ে যায়। তখন আয়াতের সার সংক্ষেপ হবে গায়েব খোলার ক্ষমতা আল্লাহর নিকট তিনি যাকে চান খুলে দেন।

আশ্চর্যের কথা হল, এ আয়াত সকল নবী বিশেষ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আউলিয়া কেরামের জন্য ইলম গায়েবকে প্রমাণ করে। তা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়; কেননা অন্য স্থানে আল্লাহ রাসূলদেরকে ইলমে গায়েব দেওয়ার কথা বলেছেন; বরং বিভিন্ন হাদিস ও মুফাসসিরীনের মতামত দ্বারা বুঝা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম ও অলীদের জন্যও ইলমে গায়েব প্রমাণিত। তাই এ

আয়াত দ্বারা যদি গায়েব অস্বীকার করা হয়, তখন দ্বন্দ দেখা দিবে। তাই সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিলে পরস্পর বৈপরিত্য দূর হয়ে যাবে এবং একটি আয়াত আরেকটির সমর্থক।

যে সকল আয়াতে ইলমে গায়েবকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা দ্বারা ভবিষ্যতের জাতী তথা প্রত্যক্ষ গায়েব উদ্দেশ্য। যা তিনি কাউকে দান করেননি এবং তা অসীম তেমনি যা সকল সম্ভাবনাময় বস্তুকে বেষ্টন করে।

কোরআন ও হাদিস দ্বারা যে সকল ইলমে গায়েব রাসূল ও আল্লাহর অলীদের জন্য প্রমাণিত তা দ্বারা দানকৃত ইলমে গায়েব, অর্থাৎ যে জ্ঞান পরোক্ষ ও অস্বতন্ত্র ও সীমিত। এ পার্থক্য খেয়াল রেখে আয়াতের ব্যাখ্যা করা উচিত। তা-ই ঈমান ও ইসলামের চাহিদা। নতুবা তা হটকারিতার পথ হবে। কেননা; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মানক্ষুন্ন করার চিন্তা করা উম্মতের জন্য কখানো উচিত নয়। তার পরিণতি ভয়াবহ।

তাফসিরে ইবনে আরবীতে এসেছে, এ আয়াতের অর্থ হল, সকল অদৃশ্যের ভান্ডার তার নিকট রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জ্ঞান খোদাপ্রদত্ত্ব। তাই এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইলমে গায়েবকে অস্বীকার করা হয়নি।

মাছআলা: (২৮৪)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

অর্থ:হে মুহাম্মদ তুমি ঘোষণা দিয়ে দাও! আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই, আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তবে আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারতাম আর কোনো অমঙ্গল ও অকল্যানই আমাকে স্পর্শ

করতে পারত না। আমি শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।[১১৬]

আয়াতে **إِلَّا** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; যা ইস্তিসনার জন্য ব্যবহার হয়। আরবী গ্রামার মতে তার নিয়মনীতি হল, মুসাল্লামুস সাবুতে তা এভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইসতিসনা না বোধককে হ্যাঁ বোধক করে ও হ্যাঁ বোধককে না বোধক করে। অর্থাৎ, ইস্তিসনার শব্দ দ্বারা যদি কোন হ্যাঁ বোধক বাক্যে আসে তখন তাকে না বোধক বানিয়ে দেয় তেমনি তার বিপরীত যদি কোন না বোধক বাক্যের উপর প্রবেশ করে তখন তাকে হ্যাঁ বোধক করে দেবে। এ আয়াতটি না বোধক তাই এখানে ইস্তিসনার শব্দ তাকে হ্যাঁ বোধক করে দেবে।

তাই এ নিয়মনীতির আলোকে অর্থ দেবে যে, আমি আল্লাহর ইচ্ছায় আমি নিজের জানের লাভ-ক্ষতির মালিক হয়।

আল্লামা শায়খ আহমদ সাবী বলেন, এ আয়াতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে লাভ ক্ষতির অস্বীকার অর্থ তিনি তার সৃষ্টিকর্তা নন।

মহান আল্লাহর বাণী: **لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ** এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নম্রতা দেখিয়েছেন। শেখ আহমদ সাবী বলেন, এ আয়াত পূর্বের কথার সাথে মিল নেই; কেননা এর পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে,

أن رسول الله صَلّى الله عليه وسلّم لم ينتقل من الدنيا حتى أعلمه الله بجميع المغيبات التى تحصل فى الدنيا و الآخرة فهو يعلمها كما هى عين يقين الخ

অর্থ: নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে যাওয়ার পূর্বে সকল অদৃশ্যের খবর দিয়েছেন যা দুনিয়া ও পরকালে ঘটবে তিনি তা নিশ্চিতভাবে জানতেন। এর উত্তরে আল্লামা সাবী বলেন, তা তিনি নম্রাকারে

[১১৬]. আরাফ:১৮৮

বলেছেন। তাই আয়াতের ভাব হবে, আমি আল্লাহর আদেশে লাভ-ক্ষতির মালিক হয় এবং তার দানে আমি ইলমে গায়েব জানি।

তাই এখানে অলঙ্কারের শীর্ষ পর্যায়ে গিয়ে খুব সুক্ষ পদ্ধতিতে ইস্‌তিসনার শব্দ দ্বারা নম্রতার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

মাছআলা: (২৮৫)

وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ .

অর্থ: হযরত আলী (রা:) বলেন, তোমরা মানুষের সাথে এ রকম কথা বার্তা বল যা মানুষ বুঝে তোমরা কি পছন্দ কর তা দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা বলা হয়।

এ হাদিসটি ইমাম বুখারী (রহ:)-এর ছুলাছিয়াতের অন্তর্ভূক্ত। তার তৃতীয় বর্ণনাকারী একজন সাহাবী। তিনি সাধারণ মুহাদ্দিসীনের বিপরীতে হাদিসের মতন এনেছেন অত:পর সনদ; কেননা তার একটি রাবী মারুফকে ইয়াহইয়া ইবনে মঈন দূর্বল বলেছেন।

তা দ্বারা বুঝা যায়, এমন কাজ যা ভাল তবে তা দ্বারা সাধারণ লোক ফিতনায় পড়ার আশংকা রয়েছে তখন তা থেকে বিরত থাকা উচিত।

অর্থাৎ, এমন কথা যার উপর কূফর ও ঈমান নির্ভর করে না সাধারণ লোক তা বুঝেনা তা বর্ণনা না করা উচিত। তাই আরেকটি হাদিসে এসেছে,

كلموا الناس على قدر عقولهم

অর্থ: মানুষদের সাথে তাদের বুঝ মতে কথা বলা চায়। তাই বর্ণিত আছে যে,

من لم يعرف أهل زمانه فهوجاهل

অর্থ: যে ব্যক্তি নিজ যুগ সম্পর্কে সচেতন নয় সে অজ্ঞ।

তার কারণ হল, যখন সাধারণ লোকের সামনে এমন অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা হয় যা বুঝার ক্ষমতা তারা রাখে না তখন তারা তাকে ভুল

বলবে আর যখন বলা হবে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বলেছেন, তখন আশংকা থাকে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যুক বলবে।

পীর মুরিদের হুকুম

মাছআলাঃ (২৮৬)

পীর মুরিদের কি হুকুম?

তা অত্যন্ত বরকতের কাজ এবং কোন বড় শায়খের হাতে বায়'আত গ্রহণ করা অনেক ভাল কাজ। যদি শায়খ বাহ্যিক জ্ঞান তথা কোরআন, হাদিস ফিকাহতে যোগ্যতা রাখে ও বিশুদ্ধ আকীদা পোষণ করে। এরকম মুর্শেদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা অত্যন্ত মোবারক। প্রকৃত পক্ষে একজন মুসলমানের জন্য মুর্শেদ হল কোরআন ও হাদিস এবং মু'মিনদের প্রধান মুর্শেদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যারা এগুণে গুণান্বিত হবেন তারা রূপকার্থে মুর্শেদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরাধিকার ঐ ব্যক্তি হতে পারে যে ঐশী জ্ঞানের বাহক। ইসলাম ধর্মের অনুসরণ ব্যতীত কেউ মুর্শেদ হতে পারে না। তা একটি ধোকা ও প্রতারণা। আমি আপসোস করি বর্তমানের অবস্থার আলোকে বলতে হয়, কিছু লোক কোন মুর্শেদের নিকট যাওয়ার পূর্বে তাকে ভাল দেখায় সাদাসিধে মনে হয়; কিন্তু যখন কারো নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে নিজকে সঠিক ঈমানদার মনে করেন তবে অপরকে ভেজাল মু'মিন মনে করেন। নিজের ভেতরে অহঙ্কার লোক দেখানো কর্ম বেড়ে যায়। তার অন্তরে প্রশস্ততা কমে আসে, অন্তর পরিস্কার হওয়ার বিপরীতে অহঙ্কারে ভর্তি হয়। জেনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি যত কোরআন হাদীছের সংস্পর্শে আসবে সে ততবেশী আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে এবং এর বিপরীতে যে ব্যক্তি যতবেশী দুনিয়ার মাল সম্পদ তালাশ করবে সে ততবেশী তাকে দুনিয়াবাজ মুর্শেদের নিকট যেতে দেখা যাবে। সে বিনয়ী হওয়ার পরিবর্তে অহঙ্কারী হবে। তার ইবাদতে লোক দেখানো ও রিয়ার সাথে যিকির আযকার পরিলক্ষিত হবে। নিখুঁত তাওহীদ চিন্তা ভাবনা দ্বারা অর্জিত হয়। নিজের পীরের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে সঠিক অন্যদেরক কূদৃষ্টি দিয়ে দেখবে।

সার কথা হল, সে বাইয়াত গ্রহণ করার পরিবর্তে তার অন্তরে পাপ-পঙ্কিলতা জন্মায়। তার মধ্যে গোপনীয়তার স্থানে প্রকাশিত হওয়া ও আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার পরিবর্তে বান্দাহর দিকে দৃষ্টি দান করে। সে মুরীদদের থেকে অনেক টাকা পয়সা অর্জনে লিপ্ত হয়ে যায়। সে নিজের পরে তার অযোগ্য সন্তানকে তার স্থলাভিষিক্ত করে মুর্শেদে কামেল হয়ে যায়। অথচ তা উত্তারাধিকারী বস্তু নয়; বরং তা বেলায়তি ও নবুয়তী কাজ। যাকে চায় বসানো যাবে না। জোরপূর্বক তা অর্জন করা যাবে না।

মাহবুবে ইলহী হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া বলেন, আল্লাহর অলীদের মর্যাদা তিন প্রকার। ১.কোন ব্যক্তি অলী হবে, কিন্তু সে নিজের বেলায়তের খবর রাখে না। মানুষেরাও তার বেলায়তের খবর রাখেনা। ২. মানুষেরা তাকে অলী হিসাবে চিনে তবে সে নিজে জানে না। ৩. সে সত্য অলী নিজেও জানে অপরেও জানে।

মাছআলাঃ (২৮৭)

মুর্শেদে জাহেল যে জানে সে উত্তম ঐ আলেম মুর্শেদের চেয়ে যে জানে না। যেমন হযরত আদম (আঃ) শয়তান থেকে উত্তম।

এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ঐ আলিম থেকে বাচ যে জানে না। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, সে ব্যক্তি কে? তিঁনি বলেন যার জিহ্বা আলিম হবে; কিন্তু অন্তর অজ্ঞ।

মাছআলাঃ (২৮৮)

যে আলেমে ফাযেলকে মুর্শেদ শিক্ষা দেবে তার উচিত প্রথমে তাকে মজলিসে মুহাম্মদীতে পৌঁছিয়ে দেওয়া এবং নিজে রাসূলের উক্তি দ্বারা কথা বলে হে মাওলানা আল্লাহ তালাশকারীর এটিই গুণ নতুবা সে অজ্ঞ। স্বাদ ঐ সময় পাওয়া যায়, যখন মুর্শেদ তাওফীকের মালিক হয় এবং মুরিদ আলেম ও ফাযেল হয় এবং তাহকীককারী হয়। অজ্ঞ কখনো আল্লাহর আরেফ হতে পারে না; বরং সে বেদ্বীন হয়ে যায়। ফকিরী ও মারেফাত অর্জন হওয়ার

জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছে একটি জ্ঞানের রাস্তা। যা জ্ঞান দ্বারা অর্জিত হয়েছে। যাকে মুফাসসির মুহাদ্দিস বলা হয়। দ্বিতীয় ইলমে বাতেন যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়।

মাছআলা: (২৮৯)

তাই যে মুর্শেদের এ দু'টির থেকে কোনো একটি অর্জন হবে না সে অজ্ঞ। আল্লাহর মারেফাত অর্জন করতে পারবে না। যা কিছু সে অলৌকিকতা দেখায় তা ইসদারাজের অন্তর্ভূক্ত।

উল্লেখ থাকে যে, আলিমগণ নবীর উত্তরাধিকার তারা প্রত্যেক প্রকার মাছআলার সমাধান দেন। কিন্তু ফকীরগণ ফানা ফিল্লাহ আরেফ বিল্লাহ ও মারেফাত অর্জন করে। তাই বলাতে ও দেখানোতে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। যার শরীরে আল্লাহর নামের প্রভাব পড়ে তার আমলে তাওফীক হয়। তার বাইরে ও ভেতরে এক প্রকার ভান্ডারে পরিণত হয়।

মাছআলা: (২৯০)

তালেবে ইলম তথা আলিমগণ ও তালেবে মাওলা তথা ফকীর গণের মধ্যে পার্থক্য: আলিমগণ তাওহীদের রাস্তা বলে দেন। কিন্তু ফকীরগণ সে জ্ঞান দ্বারা বাস্তব রাস্তা দেখান।

ইন্তেকালের পরে ইলম কিতাবে ও আমলদার আলিমগণ কবরে কিন্তু মুর্শেদে কামেল যাহের ও বাতেনে উপস্থিত থাকেন। তাদের নিকট আল্লাহর ভান্ডারের চাবি থাকে। বেলায়াতের অধিকারী ব্যক্তি কখনো মানুষের খেদমত থেকে বিমুখ হয় না। তিনি সূর্যের মত সকলকে তার ফয়েয দিতে থাকেন। প্রত্যেককে রাস্তা দেখান। মুরীদের স্তর উপস্থিতির মাধ্যমে অর্জিত হয়।[১১৭]

সায়্যিদুনা পীরানে পীর মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী (রহ:) তালেব ও মুরীদদের জন্য এমন যেমন প্রাণ শরীরের জন্য। তার মুরীদ বা তালেব ভাল

[১১৭]. আকলে বেদার:২৪।

হোক খারাপ হোক কোন অবস্থা, কাজে, কথায় কিয়ামত পর্যন্ত তার থেকে পৃথক হয় না; বরং সময়ে তাকে সাহায্য করে।

মহান আল্লাহ নবীর মারফতে গাউছে পাককে সুসংবাদ দেন যে, আব্দুল কাদের তোমার কোন মুরীদ জাহান্নামে যাবে না। কিছু ইর্ষাপরায়ণ ও মুনাফিকরা বলে, গাউছ পাকের মুরীদদের থেকেও কেউ কেউ আমল না থাকার কারণে জাহান্নামে যাবে। মনে রাখা উচিত, ঐ ব্যক্তি জাহান্নামের উপযুক্ত যে নিজে গাউছে পাকের মুরীদ হয়ে নিজেকে গাউছে পাক থেকে পৃথক বুঝে এবং যে মুরীদ নিজেকে গাউছে পাক থেকে পৃথক বুঝবে এরকম লোককে তার মুরীদ দাবী করাও বৈধ নয়।

যখন কোন ব্যক্তি গাউছে পাককে ইখলাছ বিশ্বাস ও ইয়াকীনের সাথে মুশকিলের সময় সাহায্যের জন্য আবেদন করে তখন গাউছে পাক আধ্যাত্মিকভাবে তার নিকট তাশরীফ এনে সাহায্য করে। অনেক সময় পরিষ্কার অন্তরের অধিকারী তো তাকে স্বচক্ষে দেখতে পান।[১১৮]

মাছআলাঃ (২৯১)

কাদেরী ও গাইরে কাদেরীর মাঝে পার্থক্যঃ

কাদেরী কষ্ট ও অনুসরণ বিহীন একত্ববাদী হয়। অন্যরা অনুসরণের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হয়।

মাছআলাঃ (২৯২)

যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাত লাভ করে সে ব্যক্তিকে সূফী, ফকীর মিসকিন ও গরীব বলা হয়।

তাসাউফের পরিভাষায় মিসকিন বলা হয় যার কাছে একদিনেরও খোরাক নেই। কিন্তু সে তাসাউফের ভান্ডার রাখে।

গরীব বলা হয়, ঐ ব্যক্তিকে যার শরীরে রাগ ও কঠোরতা নেই।

---

[১১৮]. আকলে বেদার:১৯।

ফকীর বলা হয়, যে সব সময় রাসূলের দিকে দৃষ্টিদান ও তার মুহাব্বাতে মগ্ন থাকে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .

অর্থ: আপনি আপনার আত্মাকে ঐ সকল লোকদের সাথে রাখেন যারা সকল-বিকাল আল্লাহকে ডাকে তারা তার রেযামন্দী তালাশ করে এবং তাদের থেকে আপনি মুখ ফিরাবেন না দুনিয়ার মোহে পড়ে।[১১৯]

মাছআলা: (২৯৩)

যে আলেমের রাসূলের সান্নিধ্য অর্জন নেই তার জ্ঞান তাকে ফায়দা দেবে না সে গাধার মত অজ্ঞ। সে মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্ছমানের এবং যে ব্যক্তি রাসুলের নামের অস্বীকার করে সে আবু জেহেল সানী।[১২০]

মাছআলা: (২৯৪)

মৃত অন্তরের জন্য তাসাউফ কঠিন। যেমন কাফিরের কালেমা পাঠ করা। কেননা; তাসাউফ দ্বারা আত্মা লজ্জিত হয়। অন্তর জীবিত হয়, আত্মা দর্শনকারী হয় এবং তাসাউফ দ্বারা মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং নফসানী স্বাদ থেকে বিরক্ত হয়।

মাছআলা: (২৯৫)

আলেম ও ফকীরের মাঝে পার্থক্য হল, আলিম ইলমের কারণে ব্যক্তিত্ব লাভ করে। আর ফকীর তামান্নার কারণে ব্যক্তিত্ব লাভ করে এবং তামান্নায় বিভোর হয়। সে আল্লাহর নৈকট্য মুহাব্বাত লাভ করে, তার প্রত্যেক বস্তুতে নৈকট্য অর্জিত হয়।

মাছআলা: (২৯৬)

---

১১৯. কাহফ:২৮।

১২০. আকলে বেদার:১৫।

ইয়াকীন কয়েক প্রকার:

১. একটি হল 'করারী' যা মুর্তিপূজক কাফির ও জ্বিনদের অর্জিত। ২. ইকরারী যা মুসলমাদের অর্জিত। ৩. ইয়াকীন ই'তেবারী যা সত্য লোকের শিক্ষা দ্বারা অর্জিত হয়, এ ধরণের বিশ্বাস পাহাড় সমতুল্য। ৪. ইয়াকীন ফকীরের সিফাত। যা দ্বারা অক্ষমদের সহযোগতিা করা হয়। তাই যার ভেতরে ইয়াকীন স্থান পাবে তার থেকে নাস্তিকতা দূরে চলে যাবে।[১২১]

মাছআলা: (২৯৭)

গাইব জানা আল্লাহর গুণ। মহান আল্লাহ নিজ বিশেষ বান্দাহদের নিজ স্পেশাল জ্ঞান দান করেন। যেমন ইলমে লুদুনী। কারো কারো আল্লাহর নৈকট্য দ্বারা ইলহাম অর্জিত হয়। এই রাস্তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদর্শিত। যে তা অস্বীকার করবে সে বাতিল। তার অন্তর মৃত।[১২২]

মাছআলা: (২৯৮)

কামেল মুর্শেদের নিদর্শন হল সে কারো নিকট মুখাপেক্ষী হবে না এবং নিজে কাশফ কারামাতের কারণে অহঙ্কারী হবে না।[১২৩]

মাছআলা: (২৯৯)

কামেল ও নাকেছের পার্থক্য:

কামেল হবে বুদ্দিমান এবং কামেল দুনিয়ার প্রাণী আহার বর্জনের প্রয়োজন মনে করে না, তার বুরুজ গণনা, রাশিফল চাওয়া ইত্যাদি প্রয়োজন হয় না।

নাকেছ ব্যক্তি সবসময় বিভিন্ন চক্করে পড়ে বে-ইজ্জত হয়। অনেক হালাল প্রাণী ভক্ষণ ছেড়ে দেয় যা কাফিরদের চরিত্র। তারা তো জাহান্নামী। কামেল দাওয়াত দানকারী যা চায় তা খায়; কেননা তার খাওয়া নূরের মুজাহেদা।

---

[১২১]. আকলে বেদার:১২।
[১২২]. আকলে বেদার:১১।
[১২৩]. আকলে বেদার:১০।

তার ঘুম মুশাহাদায়ে হুযুর। তার আলোচনা আল্লাহর যিকির। তার অন্তর বাইতুল মামুর। তার আত্মা সব সময় খুশিতে প্রফুল্ল থাকে।

মাছআলাঃ (৩০০)

যে রকম কাফিরের কালেমা তায়্যিবা পড়া মুশকিল তেমনি মৃত অন্তরের জন্য তাসাউফ মুশকিল। কেননা তাসাউফ দ্বারা আত্মা লজ্জিত হয়, অন্তর জীবিত হয়, আত্মা দর্শন লাভকারী হয় এবং তাসাউফ দ্বারা মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কূপ্রবৃত্তি থেকে বিরত হয়।[১২৪]

মাছআলাঃ (৩০১)

ফকীরের দুশমন তিন অবস্থায় থাকে। হয়ত তার অন্তর মৃত এবং ঈর্ষাপরায়ণ আলিম যার জিহ্বা জীবিত কিন্তু অন্তর মৃত এবং অন্তর বিশ্বাস থেকে শূন্য এবং ডবল অজ্ঞতায় লিপ্ত বা সে মিথ্যুক, মুনাফিক ও কাফির বা দুনিয়াদার যার বেহেশতে কোন স্থান নেই।

মাছআলাঃ (৩০২)

কামেল ফকীর দরবেশ ঐ ব্যক্তি যে এক মুহূর্তের জন্য মজলিসে মুহাম্মদী থেকে পৃথক হয় না। আর যার সবসময় মজলিসে মুহাম্মদীর সংস্পর্শ অর্জিত হবে না সে ফকীর নয়। দরবেশের মর্যাদা হল সে লাওহে মাহফুয থেকে মু'তালাআ করে।

বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ মাছআলা

মাছআলাঃ (৩০৩)

[১২৪] . আকলে বেদার:১৫।

জারজ সন্তান যখন মুসলমান জ্ঞানী (আকল সম্পন্ন) নামাজ, রোজা ইত্যাদির পাবন্দী (আদায়কারী) হবে। তার জবেহকৃত পশু মাকরূহ ব্যতীরেকে জায়েজ।[১২৫]

মাছআলা: (৩০৪)

লোক (মানুষ) ধ্বংস হয়ে গিয়াছে বলাটা নিষেধ। হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন: **ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال اذا قال الرجل هلك الناس فهوا هلكم** অর্থাৎ: যখন কোন ব্যক্তি এই কথা বলে যে- লোকগণ হালাক (ধ্বংস) হয়ে গেছে। তবে এক্ষেত্রে উক্ত ধরনের কথা বলা ব্যক্তিই অধিক ধ্বংস হওয়ার অধিকারী।

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি লোকদেরকে নিকৃষ্ট ও অনুপযুক্ত মনে করে এবং নিজের আমিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে বলে লোকগণ ধ্বংস হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে এধরনের মতপোষণকারী ব্যক্তি নিজেই অহংকারের শাস্তি হিসাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যবান লোকদের ইহকাল ত্যাগের উপর আফসোস করার নিমিত্তে বলে থাকে লোক ধ্বংস হয়ে গেছে কিংবা নিঃশেষ হয়ে গেছে, অথবা কোন বলা মুসিবত ও বিপদ অবতরনের সময় যদি লোক ধ্বংস হয়ে গেছে এই কথা বলো তাহলে উক্ত কথা বর্ণনাকারী ব্যক্তি উপরোল্লিখিত আজাবের স্বীকার হবে না।

মাছআলা: (৩০৫)

যখন একটি ঘটনার ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা বিদ্যমান থাকে। তন্মধ্যে একটি না সূচক আর অপরটি হ্যাঁ সূচক। তবে এক্ষেত্রে উসূলে হাদীস শাস্ত্রবীদদের মতে হ্যাঁ সূচক হাদীসটি না সূচক হাদীসের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার যোগ্য।

মাছআলা: (৩০৬)

[১২৫]. ফতোয়ায়ে নূরীয়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৮

যে কোরআন মজীদ হযরত জিবরীল আলাইহিস্‌সালাম হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নিয়ে এসেছিলেন তাতে সতর হাজার আয়াত ছিল। বর্তমান বিদ্যমান কোরআন শরীফে ছয় হাজার দুই শতের কাছাকাছি আয়াত রয়েছে।[১২৬]

মাছআলাঃ (৩০৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত কিয়ামত নিকটবর্তী হযরত ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হওয়ার সময়কালে লোকদের মধ্যে মাল-সম্পদ এমন অধিকহারে বৃদ্ধি পাবে যে **ওয়াফয়েদুল মালা হাত্তা লাইয়াক বালুহু আহাদা** অর্থাৎ অধিক পরিমাণে মাল-সম্পদে পরিপূর্ণ হবে এমনকি মাল-সম্পদ লওয়ার কেউ থাকবে না। (কাউকে মাল-সম্পদ স্বইচ্ছায় দিতে চাইলেও নিবেনা) **وايضا وليد عون الى المال فلا يقبله احد** এবং লোকদেরকে সম্পদ গ্রহণের জন্য ডাকা হলেও, কেউ মাল-সম্পদ গ্রহণের জন্য আসবে না।[১২৭]

মাছআলাঃ (৩০৮)

বর্তমানে দুনিয়ার (পৃথিবীর) বয়স ৫৩ লক্ষ ৬০ বৎসর।[১২৮]

মাছআলাঃ (৩০৯)

কোন অলী নবীর সমপর্যায় কিংবা নবীর স্তরে পৌঁছতে পারবে না।

মাছআলাঃ (৩১০)

কোন ব্যক্তি এমন মর্তবায় পৌঁছতে পারে না যে, নামাজ রোজা তথা শরীয়তের আদেশ নিষেধ তার থেকে রহিত। অর্থাৎ প্রত্যেকই শরীয়তের হুকুম আহকাম পালন করা আবশ্যক।

---

[১২৬]. শরহে মুসলিম, ১ম খন্ড, ৩০২পৃষ্ঠা

[১২৭]. শরহে মুসলিম, ১ম খন্ড, ২৬০-৬১ পৃষ্ঠা বাবে নুজুলে ঈসা (আঃ)

[১২৮]. তাফসীরে নুরুল এরফান ৫৫৬ পৃষ্ঠা ও খাজায়েনুল এরফান

যেখানে সৈয়্যদুল কাওনাইন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর আদেশ নিষেধ যথাযথ পালন করেছেন, সেখানে আর কারো ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।

মাছআলাঃ (৩১১)

কোরআন মজীদ ও হাদিস শরীফের জাহেরী তথা বাহ্যিক অর্থ বর্জন করে কেবল বাতেনী তথা আধ্যাত্মিক ও গুপ্ত অর্থ বুঝা ও অনুভব করা গোমরাহী ও কুফুরী।

মাছআলাঃ (৩১২)

পবিত্র কোরআনের আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদিস অগ্রাহ্য ও রদ করে মনগড়া ও অহেতুক রায় কায়েম করা কুফুরী।

মাছআলাঃ (৩১৩)

গুনাহ ও পাপ কর্মকে হালাল ও বৈধ বলে ধারণা করা এবং নেক ও পূণ্য মনে করা কুফুরী।

মাছআলাঃ (৩১৪)

শরীয়তের সঠিক বিধানের উপর মিথ্যা অপবাদ ও কলঙ্ক লেপন কুফুরী।

মাছআলাঃ (৩১৫)

যখন উম্মুল মো'মেনীন হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাদী মোবারক হয়েছিল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ২৫ বছর ২ মাস ১০দিন, আর হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহার বয়স ছিল ৪০ বছর এবং যখন উম্মুল মো'মেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাদী মোবারক হয়েছিল তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স শরীফ ছিল ৬০ বছর ৬ মাস আর হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহার

বয়স ছিল ৬ বছর। হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত শরীফের সময় আয়েশা সিদ্দিকার বয়স ছিল ৯ বছর।[১২৯]

মাছআলাঃ (৩১৬)

বুজুর্গানে দ্বীনের হাত চুম্বন করা জায়েজ, আর কদম চুম্বন করা কোন কোন বর্ণনা মতে জায়েজ বলা হয়েছে।

মাছআলাঃ (৩১৭)

খাবারের মধ্যে তিনিট ফরয, (১) হালাল খাদ্য খাওয়া (২) আল্লাহ্পাক জাল্লা শানুহুর রিজিক মনে করে খাওয়া (৩) নিজের ওমরকে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে ব্যয় করার জন্য খাওয়া। যে ব্যক্তি এ তিনটি ফরজ না জানে তার জন্য খানা খাওয়া হারাম। কেননা তা ইহুদী, নাছারা ও মুশরিকদের খানার সাদৃশ্য।[১৩০]

মাছআলাঃ (৩১৮)

ওয়াজ মাহফিল ও ইলম শিক্ষার মজলিসে যখন আলেম বলে–

صلوا على النبى او قال الغازي للقوم كبرواحيث يثاب -

অর্থাৎ আলেম ও বক্তা যখন বলেন তোমরা হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর, অথবা গাজী ও মোজাহেদ বলেন তোমরা তাকবীর পাঠ কর। এটি ছাওয়াবের মাধ্যম। অর্থাৎ এতে ছাওয়াব নিহিত।

মাছআলাঃ (৩১৯)

নুজহাতুল ক্বারী শরহে বুখারী পঞ্চম খন্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় হাদীস শরীফ দ্বারা বর্ণিত রয়েছে যে, যখন কোন ব্যক্তি কারো সাথে সাক্ষাত করতে এলে;

[১২৯]. তারিখুল ইসলাম
[১৩০]. হুজ্জাতুল ইসলাম ৮ পৃষ্ঠা

তাহলে সাধ্যনুসারে তাকে কিছু খাবাও ও পান করাও। আহলে আরবদের প্রবাদ বাক্য –

من زاراحد ولم يأكل عنده شيئًا فكانّما زارميتًا

অর্থাৎ যে কেহ কারো সাক্ষাতে গেলে এবং তাকে সেখানে কিছু খানা পানি খাওয়াইনি, তাহলে বরং সে মৃতের সাথে সাক্ষাতের জন্য গেল।[১৩১]

মাছআলাঃ (৩২০)

যখন কোন হুকুম তথা বিধি নিষেধের ক্ষেত্রে বেদআত ও সুন্নাত হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য ও সন্দিহান হলে সেক্ষেত্রে সুন্নাতকে পরিহার করতে হবে।

ردالمحتار مكروهات الصلوة میں ہے ، اذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحًا على فعل البدعة ۔[132]

মাছআলাঃ (৩২১)

আলিমগণ কোরআন মজীদের অনুবাদ তাফসীর বিহীন ও ব্যাখ্যা বিহীন হাদিসের অনুবাদ বর্ণনা করা অপছন্দ করেছেন।[১৩৩]

মাছআলাঃ (৩২২)

দাওয়াতে আমলী তিন প্রকারঃ

১. দাওয়াত পড়া, আমলিয়াত করা দৃঢ়তার সাথে যা দ্বারা জিন্নাতদেরকে কাবু করা হয়।

২. এমন দাওয়াত পড়া ও আমলিয়াত করা যা দ্বারা ফেরেশতাদেরকে কাবুতে আনা হয়। এরকম দাওয়াতের আমলকারী এক প্রকার পাগল,

---

১৩১. শরহে বুখারী, ফাওয়াদুল ফুয়াদ

১৩২. (ফতোয়ায়ে রেজভীয়া ৬ষ্ঠ খন্ড ৫২৮ পৃষ্ঠা)

১৩৩. নুযহাতুলকারী, খন্ডঃ ১ পৃঃ৪৩৭

সে সকল প্রাণীর গোস্ত, মাছ, ডিম, দুধ, পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি আহার করে না। সে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে সে যদি কোন কারণে নাপাক হয়ে যায় তখন তাকে হঠাৎ গোসল করতে হয়। তা কিছু ফেরেশতাকে কাবুতে আনার জন্য পড়া হয়। এভাবে জিন ও ফেরেশতাদেরকে কাবু করা প্রকৃত বুযুর্গানে দীনের নিকট তা কূফর, নাপাক ও হারাম।

সকল অলীগণ, শহীদগণ, গাওছ কুতুব ও আবদালের রুহ থেকে ফয়েয ও বরকত হাসিল করা তাদের আত্মার সাথে সাক্ষাত করা তাদের সাথে সফর করা এসকল আত্মাকে নিজের তত্ত্বধানে আনা এসকল অবস্থা আল্লাহর সত্ত্বায় অধিক মনোনিবেশের মাধ্যমে হয় এবং মুহাম্মদের সত্ত্বায় মানেনিবেশ তা পরিপূর্ণ হয় তা দ্বারা দয়া ও ক্ষমতা অর্জিত হয়।

কবর যিয়ারত ও আত্মা খুলে যাওয়া চশমার মত। সে ব্যক্তি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত দেশকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসে এবং সকল মানুষ তার অনুসারী হয়ে যায়। এ ধরনের লোকের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সত্ত্বায় নিমজ্জিত হয়ে যায়। তা দ্বারা আলোকিত অন্তর সৃষ্টি হয়। নবী ও অলীদের আত্মার সাথে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে অন্তরে অন্তরে মাংসপেশীতে একাত্মতা হয়ে যায়। যখন এ ধরনের আমল শুরু হয়, নবী ও সকল অলীদের আত্মা তার চতুর্দিকে বেষ্ট করে থাকে সে মাঝখানে অবস্থান করে, যে ব্যক্তি এ ধরনের দাওয়াতে আমল করতে চায় তা বৈধ। বেকুফদেরকে তো তা নসীব হবে না। এ দাওয়াতে আমল দ্বারা স্থায়ী দম, পরিপূর্ণ অন্তর ও নিঃশেষিত অন্তর অর্জিত হয়

এবং কোরআনের ত্রিশ অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা হাজার হাজার জ্ঞান অর্জন হয়। প্রত্যেক অক্ষর দ্বারা ক্ষমতার হিকমাত অর্জিত হয়।[১৩৪]

উল্লেখ থাকে যে, আলিমগণ কিতাব পড়ে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেন; কিন্তু সাহেবে দাওয়াত হাদিসের নস অন্তরে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে উত্তর দেন। যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল দ্বারা অর্জিত হয় তার শরীরের পোশাক আলো হয়, তার অন্তরে স্থায়ী আল্লাহর যিকিরের অবস্থা অর্জিত হয়।[১৩৫]

এ রাস্তায় মানুষের কু-প্রবৃত্তি ও দুনিয়াবী লালসা প্রতিবন্ধক হয়।

মাছআলাঃ (৩২৩)

মানুষের কু-প্রবৃত্তির মূল হল, অন্তর বা কলিজা। যা মানুষের বাম পাশে অবস্থিত। তা নষ্ট হওয়া অর্থ তার কু-প্রবৃত্তি শক্তি বেড়ে যাওয়া এবং পাপে নিমজ্জিত হওয়া; কেননা সেখান থেকেই রক্ত তৈরি হয় তা থেকে পুরো শরীরে সাফলাই হয়, মানুষের শক্তি খানা-পিনা থেকে সৃষ্টি হয় এবং মানুষের কামভাবের সে রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়। তাই শরীরে রক্ত থাকলে সেই শক্তি বাড়তে থাকে।[১৩৬]

মাছআলাঃ (৩২৪)

কোন ব্যক্তির ব্যাপারে সাধারণ পরিপূর্ণতা বিশ্বাস রাখা যাবে না; কেননা সকল মানুষের কোনো না কোন অপরিপূর্ণতা থাকে। নিশ্চুপ হওয়া শুধুমাত্র নবীদের বৈশিষ্ট্য। তাই সারকথা হল, নবী ছাড়া সকল

[১৩৪]. আকলে বেদার:৭৬

[১৩৫]. আকলে বেদার:৩৮

[১৩৬]. হক্কানী, খ, ৭, পৃ:৩০৮, সূরায়ে মুরসালাত

মানুষের দোষ থাকতে পারে; তাই কোন পাপ কোন ঘটনাকে পাওয়া বেলায়েতের বিপরীত নয়। হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ:) থেকে জিজ্ঞেস করা হল কোন আল্লাহর অলী কি যিনা করতে পারে? তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন অত:পর তিনি মাথা উঠালেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহর সকল কাজে তাকদীরে ফায়সালাকৃত। তাই যদি তার তাকদীরে আযল থেকে লিখা থাকে যে তার থেকে সে পাপ বের হবে তখন তা অবশ্যই হবে তবে সে তাওবার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে যায়।[১৩৭]

মাছআলা: (৩২৫)

তাওবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বান্দাহর জন্য। কেননা; বান্দাহর ধ্বংস পাপে নয়; বরং তাওবা ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে। তাই হযরত আদম (আ:) ও শয়তানের ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়।

মাছআলা: (৩২৬)

শেখ ইবনে আতা সেকান্দরী কিতাবুল হিকামে বলেন, কোন আরিফ কি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে? উত্তরে বলেন, কোন সম্পর্ক রাখে না কেননা; আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সাথে সম্পর্ক রাখা বেলায়তের বিপরীত। যদি অন্য দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় তখন সে ব্যক্তি আরেফ হিসাবে থাকবে না।[১৩৮] ।

মাছআলা: (৩২৭)

القاعدة: إن الثابت بالدلالة مثل الثابت بالنص أو أقوى منه

---

[১৩৭]. মারাজুল বাহরাইন, আব্দুল মুহাদ্দিস দেহলভী, পৃ:১৬০

[১৩৮]. মারাজূল বাহরাইন, পৃ:১৬১

যা দালালত দ্বারা প্রমাণিত তা নসের মত বা তার চেয়েও শক্তিশালী।[১৩৯] ।

মাছআলাঃ (৩২৮)

সুন্নাত দু'প্রকার একটি হল, সুন্নাতুল হুদা তা বর্জন করা মাকরূহ। অপরটি যায়েদাহ তা বর্জন কর মাকরূহ হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন রাসূলের চরিত্র দাঁড়ানোতে, বসায় ও পোশাক পরিচ্ছেদে।[১৪০]

মাছআলাঃ (৩২৯)

ইহুদীরা ঘোষ নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে আদেশ দিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহ লা'নত করেছেন যারা আদেশ প্রদানে ঘোষের লেনদেন করে।[১৪১]

ফতওয়ায়ে আলমগিরীতে রয়েছে, ফুকহায়ে কেরাম ঘোষ দেওয়া বৈধ মনে করেছেন ঐ মযলুমের জন্য যে ঘোষ দেওয়া ব্যতীত তার হক উসূল করতে পারছে না।[১৪২]

মাছআলাঃ (৩৩০)

কারো থেকে কোরআন মজীদ নেওয়ার জন্য দাঁড়ানো সুন্নাত।[১৪৩]

মাছআলাঃ (৩৩১)

মায়ের উঁচু বংশ নিয়ে কি ছেলেকে উঁচু বংশের বলা হবে?

---

[১৩৯]. কিতাবুত তাহকীক শরহে হুসামী, পৃ:১২৫
[১৪০]. হুসামী, ১০৬
[১৪১]. তিরমিযী
[১৪২]. মওয়াহেব, পারা:৬, মায়েদাহ:১১৬।
[১৪৩]. তিরয়াক নাফে, পৃ:১৮।

জবাব: পিতা যদি উচুঁ বংশের না হয় তখন মায়ের দিক দেখে তাকে উচুঁ বংশের বলা হবে না। (ফতওয়া যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম)

মাজমাউল ফতোওয়াতে তার বিপরীত মত এভাবে এসেছে যে, যদি মায়ের বংশ উঁচু হয় আর পিতার বংশ উঁচু না হয় তখন ছেলেকেও উচুঁ বংশের বলা হবে।[১৪৪]

মাছআলা: (৩৩২)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হযরত জিব্রাইল (আ:) কতবার তাশরীফ আনলেন?

প্রসিদ্ধ মতে তিনি চব্বিশ হাজার বার উপস্থিত হয়েছেন।[১৪৫]

মাছআলা: (৩৩৩)

হযরত আদম (আ:) কে কেন মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন?

আদম (আ:)-এর পূর্বে মাটি ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু ছিল না; তাই আদম (আ:) কে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।[১৪৬]

মাছআলা: (৩৩৪)

সূর্য "করসে" চাকতিতে বেশ-কম হয় না, কিন্তু চাঁদ 'করসে' বেশকম হয় কেন?

সূর্য প্রতিরাতে আরশের নিচে সিজদার অনুমিত মিলে আর চাঁদকে শুধুমাত্র চৌদ্দ তারিখে সিজদা করার জন্য অনুমতি মিলে। তাই সে

[১৪৪]. জামে সগীর, মাবসুত।

[১৪৫]. ফতওয়ায়ে যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম মিসরী পৃ:১৮৩।

[১৪৬]. ফতওয়ায়ে ইবনে নুজাইম।

জন্য চাঁদ প্রতিরাতে খুশিতে বাড়তে থাকে যাতে সে সিজদার অনুমতি পায় অত:পর সে সরু হতে থাক।[১৪৭]

মাছআলা: (৩৩৫)

সূর্য যখন ডুবে যায় তখন কোথায় অদৃশ্য হয়?

সূর্য একজাতি থেকে অস্ত গেলে অন্য জাতির জন্য তার উদয় হয়।[১৪৮]

মাছআলা: (৩৩৬)

ওয়াযের মাহফিলে সম্বোধনের খেতাবের সাথে কেন দরূদ শরীফ পড়া হয়? অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াযের মাহফিলে হাযির হয় না; তাই গায়েবের সীগাহ (শব্দ) দিয়ে সম্বোধন করা উচিত ছিল? তার জবাব হল তা সত্য; কিন্তু যারা আশেক তাদের নিকট নিকবর্তী ও দূরবর্তী একসমান। বলা হয়:

در راه عشق قرب و بعد نیست،

অর্থাৎ, আশেকদের নিকট নিকবর্তী ও দূরবর্তী একসমান।

কবি বলেন,

خيالك فى عينى و ذكرك فى فمى: و مثواك فى قلبى فأين تغيب

অর্থ: আপনার চিত্র আমার চোখে ও আপনার আলোচনা আমার মুখে: আপনার ঠিকানা আমার অন্তরে তাই কোথাই তা বিলুপ্ত হবে।

হযরত ইমাম আব্দুর রউফ ইবনে মুনাবী (রহ:) বলতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বৈঠক যেখানে তার প্রতি দরূদ

[১৪৭]. ফতওয়ায়ে ইবনে নুজাইম।

[১৪৮]. ফতওয়ায়ে ইবনে নুজাইম।

পাঠ করা হয় হাযির হন। তাই তোমরা তার প্রতি অধিকহারে দরূদ পাঠ কর এবং বৈঠককে দরূদ শরীফ দ্বারা সৌন্দর্য কর।[১৪৯]

মাছআলা: (৩৩৭)

তাওহীদের মজলিসে অন্য কারো আলোচনা করা তাওহীদে খালেছের বিপরীত।

হ্যাঁ তাওহীদের আলোচনা ও দাবীর সাথে সাথে দলীলও দেওয়া জরুরী। কেননা; সাধরাণ নীতি মোতাবেক দলীল বিহীন দাবী পেশ করা বাতিল। তাই তাওহীদের দলীল হিসাবে কোরআনের দলীল পেশ করতে হয়। মহান আল্লাহ বলেন, **لقدجاءكم برهان من ربكم** অর্থাৎ, তোমাদের নিকট তার পক্ষ থেকে দলীল এসেছে এখানে দলীল বলতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য দলীলে কোন না কোন সন্দেহ থাকতে পারে তবে এটি এমন একটি দলীল যেখানে কোন ধরণের সন্দেহ থাকতে পারেনা। তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওহীদের দলীল এবং দলীলের দাবীর জন্য সবসময় প্রয়োজন যেহেতু তাওহীদের মজলিসে দলীল না থাকা দাবী বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই তাওহীদের সাথে দলীলের আলোচনা জরুরী বিষয়। দলীল না থাকলে দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই অন্যান্য দল তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টানের তাওহীদের দলীল না থাকাতে তাদের বিশ্বাস ভ্রান্ত।

মাছআলা: (৩৩৮)

দু'আতে হাত উঠানো কি রকম?

দু'আতে উভয় হাত বরাবর উঠানো সুন্নাত।[১৫০]

---

[১৪৯]. মুওলাদুল মুনাবী:পৃ:১০।

[১৫০]. আত তিরয়াকুন নাফে:৪৭।

মাছআলাঃ (৩৩৯)

দু'আর সময় আসমানের দিকে হাত উঠানোর কি হুকুম? দু'আর সময় আসমানের দিকে হাত উঠানো উচিত নয়।[১৫১]

দু'আর শুরুতে হামদ-দরূদ পাঠ ও কেবলামুখী হওয়া সুন্নাত।

মাছআলাঃ (৩৪০)

নাপাক অবস্থায় কোরআন মজীদ স্পর্শ করা এবং কোরআন বিশিষ্ট বক্স উঠানোর কি হুকুম?

নাপাক অবস্থায় কোরআন মজীদ স্পর্শ করা এবং কোরআনের বক্স উঠানো নিষিদ্ধ ও হারাম।[১৫২]

মাছআলাঃ (৩৪১)

হায়েয অবস্থায় মহিলাদের সাথে সহবাস করা বৈধ কিনা?

জেনে শুনে হায়েয অবস্থায় মহিলাদের সাথে সহবাস করা হারাম ও কবরী গুনাহ। ইমাম শাফেয়ীর নিকট হালাল বুঝা কূফরী।[১৫৩]

মাছআলাঃ (৩৪২)

সমুদ্রের মাছে কি মহিলাদের মত যৌনিপথ রয়েছে?

হ্যাঁ মহিলাদের মত সমুদ্রের মাছেও যৌনিপথ রয়েছে। অনেক মাঝিরা তাদের সাথে মিলন করে তখনও গোসল ওয়াজিব হবে যদি বীর্যপাত হয়। তবে তা করা হারাম ও গুনাহের কাজ।

মাছআলাঃ (৩৪৩)

মানুষকে বশর কেন বলা হয়?

---

[১৫১]. আত তিরয়াকুন নাফে

[১৫২]. আত তিরয়াকুন নাফে:১৮।

[১৫৩]. আত তিরয়াকুন নাফে:২০।

হ্যাঁ বশর দ্বারা বনী আদম বুঝানো হয়। তার কারণ; তাদের বশর তথা বাহ্যিক চামড়া প্রকাশিত থাকে।[১৫৪]

মাছআলা: (৩৪৪)

একটি হরিনের ঘটনা যেখানে রয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হরিণের মায়ের সাথে কথা বলেন, তার দু'জন বাচ্চাকে দুধ পান করানোর কথা রয়েছে তা কতটুকু সত্য।

মুহাদ্দিসীনগণ এহাদিসকে জাল বলেছেন।[১৫৫]

মাছআলা: (৩৪৫)

জিব্রাইল (আ:) কোন কোন নবীর নিকট কতবার তাশরীফ আনলেন? এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তার নিজ আকৃতিতে কতবার দেখেলেন?

তিনি হযরত আদম (আ:) এর নিকট ১২ বার তাশরীফ এনেছিলেন। হযরত ইদ্রীছ (আ:) এর নিকট আসলেন ৪ বার, হযরত নূহ (আ:) এর নিকট আসলেন ৫৫ বার। হযরত ইব্রাহীম (আ:) এর নিকট আসলেন ৪২ বার। হযরত মূসা (আ:) এর নিকট আসলেন ৪০০বার, হযরত ঈসা (আ:) এর নিকট আসলেন ১০ বার, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসলেন ২৪০০০ চব্বিশ হাজার বার। তবে দু'বার তিনি তাকে সশরীরে দেখেন একবার নবুয়তের প্রাথমিক সময়ে যখন সূরায়ে মুদ্দাসির অবতীর্ণ হয়। দ্বিতীয়বার মেরাজে গমনের সময়, যখন তিনি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পাড়ি দিলেন।

তার ছয়শত ডানা রয়েছে। শায়খ দেহলভী তা তদন্তাকারে উল্লেখ করেছেন।[১৫৬]

---

[১৫৪]. জাওহারাতুত তাওহীদ, ১৪১।

[১৫৫]. জাওহারা:১৪০।

মাছআলাঃ (৩৪৬)

ইমাম আযম কোন কোন হাদিসকে যাচাই বাচাইয়ের পর নির্বাচন করেছেন?

হযরত মাখদুম শায়খ আহমদ খামাশখানবী (রহ:) জামেউল উসূল কিতাবে লিখেন, ইমাম আযম নিজ ছেলে হাম্মাদকে নসীহত করে বলেন, হে প্রিয় বৎস! আমি পাঁচ লাখ হাদিস থেকে যাচাই বাচাই করে পাঁচটি হাদিস নির্বাচন করেছি যদি তুমি সেই পাঁচ হাদিস মুখস্থ করে তা মতে আমল কর উভয় জাহানের কল্যাণ লাভ করবে। সে পাঁচ হাদিস হল:

১. **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভর।

২. **لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.** অর্থ তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে না।

৩. **وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ،** মুসলমান হল, যার হাত পা দ্বারা অপরজন নিরাপদ থাকে।

৪. **«إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»** মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল সে সকল অহেতুক কাজ বর্জন করবে।

৫. **إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ،** হালাল প্রকাশিত ও হারাম প্রকাশিত মাঝখানে সন্দেহযুক্ত বস্তু রয়েছে

[১৫৬]. তাফরীহুল আযকিয়া, খ, ২ পৃ:৩৫।

যা মানুষ জানে না; তাই যে ব্যক্তি সকল সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বিরত থাকবে সে নিজের দ্বীন ও সম্মান হেফাযতে রাখবে।[১৫৭]

মাছআলা: (৩৪৭)

ইমাম আযম (রহ:) বলেন, যে কোন বিশুদ্ধ মত আমার মাযহাব। অর্থাৎ, যদি কোন বিশুদ্ধ মাযহাব পাওয়া যায় তা আমার মাযহাব। এর বিপরীতে আমার কথাকে দেওয়ালে মার। তার কি অর্থ?

তার মর্মার্থ হল, যদি কারো আমার কোন কথার ব্যাপারে সন্দেহ আসে এবং এর বিপরীতে কোন বিশুদ্ধ হাদিস তার নিকট থাকে তখন সে হাদিস মতে আমল করবে।[১৫৮]

মাছআলা: (৩৪৮)

তিরমিযী শরীফে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ ، فَارْتَعُوا ، قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : حِلَقُ الذِّكْرِ.

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে যাবে তখন তোমরা তা থেকে বিচরন কর তখন বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল জান্নাতের বাগান কি? তখন তিনি বলেন, যিকিরের হালকা।

মাছআলা: (৩৪৯)

[১৫৭]. নওয়াদেরুল হাদিস, পৃ:৩১।
[১৫৮]. তানবীরুল কুলুব:৩১৬।

ওয়াক্‌ফ কৃত কবরে ঘর বানানো হারাম, নবী, শহীদ, আলিম ও নেককার ব্যতীত।[১৫৯]

মাছআলাঃ (৩৫০)

সূদ খাওয়া মৃত্যুর সময় অশুভ পরিণামের আশংখা রয়েছে।

মাছআলাঃ (৩৫১)

দাঁড়ির আশপাশ কাটা ও চাটার কি হুকুম?

মুসনাদে এসেছে, আবু কুহাফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পিতা মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমাতে এসেছেন তাঁর দাঁড়ি লম্বা হওয়ার কারণে এলোমেলো ছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাঁড়ির দিকে ইশারা করে, বলেন, তুমি যদি তা একটু চাটতে। তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাঁড়ির দৈর্ঘ প্রস্থ কাটতেন।

মাছআলাঃ (৩৫২)

কোন মুসলমানদের মসীবতে খুশি হওয়ার কি বিধান?

হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা' থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি তুমি মুসলমান ভাইয়ের মসীবতে খুশি প্রকাশ করো না নতুবা আল্লাহ তায়ালা তাকে সে মসীবত থেকে নিস্কৃতি দিবেন এবং তোমাকে তাতে লিপ্ত করবেন।

[১৫৯]. তানবীরুল কুলুব:১৭৯।

এটি বাস্তবে জ্ঞানের কথা। দেখা যায়, নিজ মতের বিপরীত লোকের মসীবতে মানুষ খুশি প্রকাশ করে। আল্লাহ তায়ালা ফলাফল তার বিপরীত করতে কত সময় লাগে।

মাছআলাঃ (৩৫৩)

শেষ যমানায় মানুষের অবস্থাঃ

মুসানাদে হযরত আবু হুরাইরা (রা:) থেকে বর্ণিত, মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে তখন লোকেরা অধিকহারে কবরে যাবে সেখানে তারা নিজের পেট রাখবে এবং বলবে আমাদের আশা আমরা যদি এ কবরবাসীর স্থানে হতাম, তার থেকে জিজ্ঞেস করা হল তা কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তা যুগের কঠোরতা, মসীবত ও ফিতনার কারণে।

ইবনে মাজাহতে হযরত আবূ হুরাইরা (রা:) সুত্রে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জান রয়েছে দুনিয়া ঐ সময় পর্যন্ত শেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত একজন লোক কবরের পাশ দিয়ে যাবে তার উপর পড়বে এবং বলবে আমি যদি এ কবর বাসীর স্থানে হতাম। তখন ধর্ম পুরোপুরি পরীক্ষায় ভরে যাবে। এ যুগ থেকে আল্লাহর পানাহ। কেননা; সে সময় মানুষ নিজের মুখ দিয়ে নিজের মৃত্যু তালাশ করবে এবং নিজের মৃত্যুকে নিজের জীবনের উপর প্রাধান্য দিবে। তখন মানুষের সকল বাসনা দুনিয়ার সাথে হবে। তখন তারা মৃত্যুতে তাদের শান্তি দেখবে।

মাছআলাঃ (৩৫৪)

কোরআনের আয়াত ও হাদিস মর্মার্থের দিক দিয়ে চার প্রকারঃ ১. ইশারাতুন নস ২. দালালাতুন নস। ৩. ইবারাতুন নস। ৪. ইকতিজাউন নস।

তেমনি যে কোন শব্দ অর্থের দিক দিয়ে চার প্রকারঃ-১. আভিধানিক। ২. শরয়ী ৩. ওরফে আম ৪. ওরফে খাস।

যেহেতু কোরআনের আয়াত ও হাদিসে উল্লিখিত যে কোন একটির আলোকে অর্থ প্রকাশ করে; তাই বুঝার বিষয় এ চার প্রকারের বাইরে কোন অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়।

একই কথা শব্দের ব্যাপারে। যে অর্থ উল্লিখিত অর্থ থেকে কোন একটির সাথে সম্পর্ক রাখবে না তা গ্রহণযোগ্য নয়।

জেনে রাখা উচিত যে, কোরআনের শব্দের অর্থ ও মর্ম বুঝা অনেক দুরূহ। বানোয়াট অর্থ বর্ণনা নিষেধ।

মাছআলাঃ (৩৫৫)

মানুষের সাথে জীবন যাপন।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ:) নিজ ছাত্র ইমাম আবু ইউছুফ ইবনে কারেদ সিতী বসরীর নিকট অসীয়ত নামা লিখে পাঠান যেখানে লেখা ছিল, এ কারণকে তুমি ভাল করে বুঝ। যখন তুমি মানুষের সাথে জীবনযাপনকে খারাপ বুঝবে তখন তারা তোমাকে দুশমন বুঝবে সে তোমার মাতাপিতা হোকনা কেন এবং যখন তুমি সমাজের সাথে ভাল আচরণ করবে তখন সেই সমাজ তোমাকে ভাল বাসবে এবং তার সকল সদস্য তোমার জন্য মাতাপিতার মত হবে।[১৬০]

মাছআলাঃ (৩৫৬)

[১৬০]. অসীয়ত নামা ইমাম আযম, ২।

নিয়তের ভিন্নতার কারণে বিধানে তারতম্য:

যেমন যখন কোন খতীব হাঁচি দিল অত:পর সে আলহামদুলিল্লাহ বলল, যদি তা দ্বারা সে খুতবা উদ্দেশ্য নিল তখন তা সহীহ হবে, আর যদি সে হাঁচির দু'আ নিল তখন তা বিশুদ্ধ হবে না। তেমনি কেউ যবেহের সময় হাঁচি দিল তখন হাচির দু'আ হিসাবে আলহামদুলিল্লাহ পড়ল তখন বিশুদ্ধ হবে না। পার্থক্য হল, যবেহের সময় তাসমিয়া পড়া ওয়াজিব।[১৬১]

মাছআলা: (৩৫৭)

সকল বস্তুর মূল হল মুবাহ।[১৬২]

মাছআলা: (৩৫৮)

যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে মাতাপিতা বা কারো কবর যিয়ারত করে তখন যিয়ারতকারী ও জাহান্নামের মাঝখানে পর্দা হবে এবং সাধারণ লোকের কবর যিয়ারত করা অন্তরের কঠোরতা দূর করেন।

হযরত ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি নিজ মাতাপিতার কবর যিয়ারত করবে বা মাতা বা শুধু পিতার কবর সওয়াবের আশায় যিয়ারত করবে তার জন্য জ্ঞান আমার থেকে পর্দা হবে।[১৬৩]

[১৬১]. আল আশবাহ ওয়ান নযায়ের, খ, ১ পৃ:১৯০।
[১৬২]. ফতওয়ায়ে কাযীখান, খ, ৪ পৃ:৩৬৩।
[১৬৩]. দসতুরুল কাযা, ১৫২।

বর্ণিত আছে যে, একজন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কবরের দিকে তাকাও।[১৬৪]

মাছআলাঃ (৩৫৯)

কোরআন মজীদ উত্তম না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম? তাতে মত্যনৈক্য রয়েছে, ফতওয়ায়ে শামীতে এসেছে সেখানে মতানৈক্য রয়েছে তবে নিশ্চুপ থাকা ভাল।

মাছআলাঃ (৩৬০)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للمؤمن أن يذل نفسه ، قيل: يا رسول الله! وكيف يذل نفسه قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق .

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মু'মিনের উচিত নয় নিজকে বে-ইজ্জত করা তখন তাকে বল হল কিভাবে সে নিজকে বে ইজ্জত করবে তিনি বলেন সে নিজেকে এমন মসীবতের সামনে পেশ করবে, যা সে বরদাশত করতে পারবে না।[১৬৫]

মাছআলাঃ (৩৬১)

[১৬৪]. দসতুরুল কুযাত, ১৫২।
[১৬৫]. মৃসনাদে ইমাম আযম, পৃ:৩৬৪

মানুষ যদি না বুঝার কারণে নিজকে কঠিন ইবাদতে লিপ্ত করে দেয় তখন সে অধিকাংশ সে রোগে আক্রান্ত হয়ে যায় যার কারণে অনেক সময় ধ্বংস হয়ে যায় এবং ইবাদত বন্দেগীও ছেড়ে দেয় তাই শরীয়তে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরকম আমল শারীরিক ক্ষতি বহন করে।

মাছআলা: (৩৬২)

عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل من الأنصار إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم فقال يا رسول الله ما رزقت ولدا قط و لا ولد لى قال النبى صلّى الله عليه وسلّم فأين أنت من كثرة الاستغفار و كثرة الصدقة .

অর্থ: হযরত জাবের (রা:) থেকে বর্ণিত, এক আনসারী ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাযির হলেন এবং বললেন হে আল্লাহর রাসূল আমার কখনো কোন সন্তান নসীব হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তুমি অধিকহারে ইসতিগফার কর এবং অধিকহারে সদকা কর এর বরকতে তুমি সন্তানের মালিক হবে, তখন সে অধিকহারে সদকা করা আরম্ভ করেছে এবং অধিকহারে ইসতিগফার করছে। হযরত জাবের (রা:) বলেন তখন তার নয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করল।

বাস্তবে এ বিধানটি নিম্নোক্ত আয়াত থেকে নির্গত। নূহ (আ:) এর আলোচনা চলছে তিনি নিজ উম্মতকে সম্বোধন করে বলেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٥) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ

অর্থ: তোমরা রবের কাছে ক্ষমা তালাশ কর কেননা তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদেরকে ক্ষমাশীল ও আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষন করবেন এবং তোমাদেরকে মাল ও সন্তান দিয়ে সাহায্য করবেন।[১৬৬]

মাছআলা: (৩৬৩)

জেনে রাখা উচিত হাতে চুমু খাওয়া পায়ে চুমু খাওয়া মুস্তাহাব। কখনো তা বিদা'আত ও হারাম নয়। বরং তা সুন্নাত প্রত্যেক অবস্থায় তা সুন্নাত। তা অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরিন, ওলামায়ে মুহাক্কিকীন ও আকাবের সূফিয়ায়ে কেরাম থেকে তা প্রমাণিত। তাতে কিছু গাইরে মুকাল্লিদ আলিম ছাড়া কারো মতানৈক্য নেই। তাদের হাত পা চুমু খাওয়া তাদের সম্মানের জন্য। তা সিজদা নয় বরং তা দ্বারা তার ফয়েয বরকত হাসিল করা। তাকে সিজদা আখ্যায়িত করা প্রতারণা। আল্লাহ ওয়ালা থেকে ফয়েয হাসিল করা ঈমানী নূর অর্জন। মহান আল্লাহ কোরআন, হাদিস শরীফের, আউলিয়ায়ে কেরাম, ও আলিমদের ফয়েয নবীর অসীলায় আমাদের দান করুন!

মাছআলা: (৩৬৪)

কোন পুরুষ ওযর ব্যতীত নিজের চেহারা ঢাকা মাকরূহ।

মাছআলা: (৩৬৫)

মদে লবণ ঢালাতে সিরকা তৈরী হয় মৃতের চামড়া দাবাগত দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়।[১৬৭]

---

[১৬৬]. নূহ:১০-১১, মুসনাদ:৩৬৫

[১৬৭]. হিয়ারাতুল ফিকাহ।

মাছআলাঃ (৩৬৬)

যে ব্যক্তি দু'আয়ে কুনুত পড়তে জানে না; তার বিবাহ সহীহ না।[১৬৮]

মাছআলাঃ (৩৬৭):

কোরআন মজীদ ও হাদিসের বাহ্যিক অর্থ ছেড়ে শুধু ভেতরের অর্থ নেয়া কূফরী।

মাছআলাঃ (৩৬৮):

কোরআনের আয়াত ও সহীহ হাদিস ছেড়ে হালকা, গুরুত্বহীন রায় নেওয়া কূফরী।

মাছআলাঃ (৩৬৯)

পাপকে হালাল বুঝা ও ভাল বুঝা কূফরী।

মাছআলাঃ (৩৭০)

সত্য শরীয়তের উপর অপবাদ দেওয়া কূফরী।

মাছআলাঃ (৩৭১)

আল্লাহর ভয় ছেড়ে দেওয়া কূফরী।

মাছআলাঃ (৩৭২)

আল্লাহ থেকে নৈরাশ হওয়া কূফরী।

মাছআলাঃ (৩৭৩)

নবীর শানে ত্রুটি তালাশ করা বা বর্ণনা করা কূফরী।

সমাপ্ত

[১৬৮]. হুজ্জাতুল ইসলাম।